وَاَشۡرَقَتِ الۡاَرۡضُ بِنُوۡرِ رَبِّہَا

# নূরুদ্দীন

NURUDDIN

2021

খেলাফত সংখ্যা

খেলাফত স্মৃতিস্তম্ভ, কাদিয়ান

Jamia Ahmadiyya Bangladesh

সৈয়দনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সাথে 'জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ'-এর ঐতিহাসিক ভার্চুয়াল মোলাকাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# নূরুদ্দীন

NURUDDIN

২০২১

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

নূরুদ্দীন
NURUDDIN

বর্ষ ১২ ▪ সংখ্যা ১ ▪ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের মুখপত্র



**সম্পাদকীয় পরিষদের সভাপতি**

মোবাশশেরউর রহমান
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

**সম্পাদক**

মাসুম আহমদ

**সহকারি সম্পাদক**

জহিরউদ্দীন আহমদ
সুলতান মাহমুদ আনোয়ার



**প্রকাশক**

**জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ**
আহমদনগর, পঞ্চগড়

**JAMIA AHMADIYYA BANGLADESH**
Ahmadnagar, Panchagarh
Phone: +88 02 7300428, Fax: +88 02 7301854
E-mail: jamia.bd2006@gmail.com

**মুদ্রণে**

ইন্টারকন এসোসিয়েটস, ৪৫/এ নিউ আরামবাগ, ঢাকা


# সূচিপত্র


৪ কুরআন

৫ হাদীস

৬ অমৃত বাণী

৭ ইসলামী খেলাফত ও তার কল্যাণ
মাওলানা বশীরুর রহমান

১০ কবিতা: ‘কুদরতে সানীয়া’
সফিক আহমদ চৌধুরী

১১ হাদীসের আলোকে আহমদীয়া খেলাফত
মাওলানা সালেহ আহমদ

১৪ কবিতা: ‘উৎসর্গ’
মুহাম্মদ সমিউল ইসলাম

১৫ আল্লাহ্ তা'লার সাথে ঐশী সম্পর্কের প্রমাণ
মাওলানা জাফর আহমদ

১৮ খলীফা আমাদের ‘রক্ষাকবচ’
মাওলানা মাসুম আহমদ

২২ কবিতা: ‘চিরন্তন সত্য’
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম

২৩ ঐশী খলীফা এবং রাষ্ট্রনায়ক– দু'টি এক কথা নয়
মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার

২৬ আহমদীয়া খেলাফতই প্রতিশ্রুত ঐশী খেলাফত
মাওলানা জহির উদ্দীন আহমদ

৩১ ঐশী খেলাফত বনাম জাগতিক খেলাফত
মাওলানা সৈয়দ মোজাফ্ফর আহমদ

৩৫ ঐশী খেলাফত ও আমাদের দায়-দায়িত্ব
মাওলানা নাসের আহমদ

৩৯ ধর্মে খেলাফতের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব
মাওলানা মোমেন হোসেন

৪১ আহমদীয়া জামা'তের খলীফাগণের দোয়া গৃহীত হওয়ার কিছু ঘটনা
মাওলানা মুহাম্মদ আল হক

৪৫ খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ
সোলায়মান আহমদ

৪৭ ‘খোলাফায়ে রাশেদীন’-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং ইসলাম সেবায় অসামান্য অবদান
মুহাম্মদ তারীফ হোসেন

৫২ ‘খলীফাতুল মসীহ্’-গণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তাঁদের ইসলামসেবা
মুহাম্মদ উসমান গনি

৫৭ প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এবং খলীফাতুল মসীহ্গণের আলোকচিত্র

৬১ শিক্ষা সফর-২০১৯ (স্থান: কক্সবাজার, সেন্ট মার্টিন ও মহেশখালী)
মাসুম আহমদ

৬৫ আলোকচিত্র (রঙিন)

৬৯ শিক্ষা সফর-২০২০ (স্থান: কুষ্টিয়া, খুলনা, বাগেরহাট ও সুন্দরবন)
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম

৭৩ SPIRITUAL RENOVATION AND MODERN SOCIETY
Imran Sayed

৭৫ A BRIEF HISTORY OF JAMIA AHMADIYYA BANGLADESH
Mobasherur Rahman

# সম্পাদকীয়

যখন থেকে আল্লাহ্ তা'লা দুনিয়াতে নবুয়্যতের নিয়ম প্রচলিত করেছেন তখন থেকে তার সঙ্গে খেলাফতের ধারাও প্রবর্তন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে **'নবুয়্যত'** ও **'খেলাফত'** একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং একই দেহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে সংযুক্ত। খেলাফত ছাড়া কখনও নবুয়্যত প্রবর্তিত হয়নি এবং নবুয়্যত ছাড়া কখনও কোন খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নবী করীম হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

مَا كَانَتْ نُبُوَّةٌ قَطُّ اِلَّا تَبِعَتْهَا خِلَافَةٌ

অর্থাৎ, **"প্রত্যেক নবুয়্যতের পর অবশ্যই খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"** *(কানযুল উম্মাল)*

হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর ইন্তেকালের সংবাদে যখন সাহাবাগণ পাগলপারা তখন এই বিশৃঙ্খল ও বিক্ষিপ্ত পরিস্থিতি খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রণে আসে। হাদীস শরীফে রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী থেকে জানা যায় রসূলে করীম (সা.)-এর পর সেই খেলাফতে রাশেদাও দীর্ঘদিন স্থায়ী হবে না। এই খেলাফতে রাশেদার পর অন্যায় যুলুম ও জবরদস্তিমুলক রাজত্বের একটি দীর্ঘ যুগ অতিবাহিত হবে এরপর পুনরায় নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।

এসব ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে মুসলমানদের চরম অধঃপতনের সময় বিশেষ করে দাজ্জালের নীল দংশনে যখন দলে দলে মুসলমান এমনকি বড় বড় আলেম খ্রিষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করতে লাগলো তখন আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর উম্মতকে রক্ষার জন্য তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি (আ.) ১৮৮৯ সালে তাঁর জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯০৮ সনে ইন্তেকাল করেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর উম্মতকে একত্রিত করার জন্য এবং সমগ্র বিশ্বের মানুষকে এক কলেমার পতাকাতলে সমবেত করার জন্য কাজ করে যান এবং তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে ইহকাল ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলমানদের মাঝে পুনরায় **'খেলাফত ব্যবস্থা'** প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই খেলাফতকে আমরা **'খেলাফতে আহমদীয়া'** বলে জানি যা রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী নবুয়তের পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত সেই **'প্রতিশ্রুত খেলাফত'**।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর মৃত্যুর পর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুসংবাদ তার জামা'তকে দিয়ে গেছেন। তিনি (আ.) বলেন- **"অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহ্ তা'লার বিধান হচ্ছে, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং খোদা তা'লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন; এটা সম্ভবপর নয়। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা এটি স্থায়ী, এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু যখন আমি চলে যাবো, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে।"** *(পুস্তক আল-ওসীয়্যত)*

ইসলামের জীবিত হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে যথাসময়ে আবির্ভূত করেন। ইসলামের নবজাগরণ সূচিত হয়। জামাতে আহমদীয়ার মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা **'দ্বিতীয় কুদরত'** খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করেন। যারা খোদার এ পুরস্কার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারা গোমরাহী ও অন্ধকারে নিপতিত হয়েছে। আজও বঞ্চনা ও বিফলতা তাদের ভাগ্যের লিখনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যারা খেলাফতের জ্যোতিতে নিজেদের হৃদয় আলোকিত করেছে তারা সেই খেলাফতরূপী প্রদীপের উপর পতঙ্গের ন্যায় বিলীন হয়েছে এবং যুগখলীফার প্রত্যেক ডাকে **'লাব্বায়েক' 'লাব্বায়েক'** বলে নিজেদের প্রাণ, সম্পদ এবং মান-সম্ভ্রমের কুরবানি পেশ করাকে নিজেদের সৌভাগ্য বলে মনে করেছে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে নিয়ামত অর্থাৎ ঐশী খেলাফত প্রদান করেছেন, এ অবস্থায় আমাদের দায়-দায়িত্ব কী তা জেনে সে অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করা আবশ্যক। এজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে না জানতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলোর উপর আমরা আমলকারী হতে পারবো না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আমার ওসীয়্যত হলো, **"হাবলুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার রজ্জুর সাথে তোমাদের সম্পর্ক যেন দৃঢ় হয়। নিজেদের মাঝে কোন ঝগড়া বিবাদ করো না; কেননা ঝগড়া বিবাদ আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের আগমনকে বাধাগ্রস্থ করে। তোমাদের সাথে ইমামের এমন সম্পর্ক হওয়া উচিত, যেমনটি গোসলদাতার হাতে লাশের হয়। তোমাদের সকল আশা আকাঙ্খা যেন মৃত হয়। তোমরা নিজেদেরকে ইমামের সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত কর যেভাবে ইঞ্জিনের সম্পর্ক গাড়ির সাথে থাকে। প্রতিদিন আত্মবিশ্লেষণ কর যে, তোমরা নিজেদেরকে অন্ধকার থেকে বের করতে পেরেছ কি না?"** *(খুতবাতে নূর, পৃষ্ঠা: ১৩১)*

# কুরআন

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ
دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ
يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝٥٦

## অনুবাদ

"তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেরূপে তিনি তাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন এবং নিশ্চয় তিনি তাদের সেই দ্বীনকে সুদৃঢ় করবেন যাকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং নিশ্চয় তিনি তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর তাকে তাদের জন্য শান্তিতে পরিবর্তন করে দিবেন; তারা আমার ইবাদত করবে এবং কোন কিছুকে আমার সাথে শরীক করবে না; এরপর যারা অস্বীকার করবে তারা দুষ্কৃতিপরায়ণ বলে সাব্যস্ত হবে।"

*[সূরা আন নূর: ৫৬]*

# হাদীস

تَكُوْنُ النُّبُوَّةُ فِيْكُمْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَكُوْنَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا اِذَا شَاءَ اَنْ يَّرْفَعَهَا ،
ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةٌ عَلٰى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ، فَتَكُوْنُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَكُوْنَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا
اِذَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا عَاضًّا ' فَيَكُوْنُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَكُوْنَ ،
ثُمَّ يَرْفَعُهَا اِذَا شَاءَ اَنْ يَّرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً ' فَتَكُوْنُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ
تَكُوْنَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا اِذَا شَاءَ اَنْ يَّرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةٌ عَلٰى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ
سَكَتَ (مسند احمد- بيهقى- مشكوٰة)

## অনুবাদ

"হযরত নু'মান বিন বশীর হযরত হুযায়ফা হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, এরপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। তা ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, এরপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন তা এক অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, এরপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নিবেন, তখন নবুয়্যতের পদ্ধতিতে পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। মহানবী (সা.) এরপর নীরব হয়ে যান।"

*[মুসনাদ আহমদ, বায়হাকী, মিশকাত]*

# অমৃত বাণী

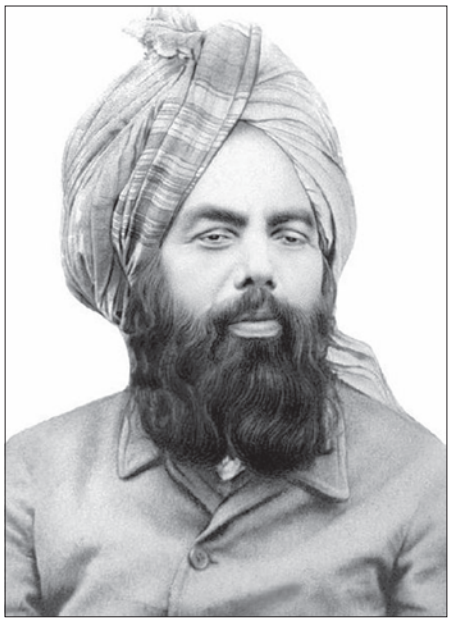

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)

... খোদাতা'লা দুই প্রকারের কুদরত (শক্তি ও মহিমা) প্রকাশ করেন: ১। নবীদের মাধ্যমে তাঁর শক্তির এক হাত প্রদর্শন করেন । ২। অপর হাত এরূপ সময় প্রদর্শন করেন যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করে মনে করে যে, এখন নবীর কাজ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তখন তাদের এ প্রত্যয়ও জন্মে যে, এখন জামা'ত ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমনকি জামা'তের লোকজনও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন, তাদের কোমর ভেঙ্গে পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়। তখন খোদা তা'লা দ্বিতীয়বার নিজ মহাকুদরত প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন। সুতরাং যারা শেষ নাগাদ ধৈর্য অবলম্বন করে তারা খোদা তা'লার এ **"মু'জিযা"** দেখতে পায়। যেভাবে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.)-এর সময় হয়েছিল। যখন আঁ-হযরত (সা.)-এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকালমৃত্যু মনে করা হয়েছিল; বহু মরুবাসী অজ্ঞলোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবীরাও শোকাভিভূত হয়ে উন্মাদের মত হয়ে পড়েছিলেন। তখন খোদা তা'লা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে দাঁড় করিয়ে পুনর্বার তাঁর শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করেন। তিনি ইসলামকে বিলুপ্তির পথ থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁর দেয়া সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন যা তিনি করেছিলেন।...

অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহ্ তা'লার বিধান হচ্ছে, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং খোদা তা'লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন এখন এটা সম্ভবপর নয়। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য **দ্বিতীয় কুদরত** দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী, এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই **দ্বিতীয় কুদরত** আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না কিন্তু যখন আমি চলে যাবো, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে। যেহেতু **'বারাহীনে আহমদীয়া'** গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদা তা'লা বলেছেন, 'আমি তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর প্রাধান্য দেবো' (অনুবাদক)।

*[আল ওসীয়্যত]*

# ইসলামী খেলাফত ও তার কল্যাণ

মাওলানা বশীরুর রহমান
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আল্লাহ তা'লা মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য নবী-রসূলকে আবির্ভূত করেন। তাঁরা আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীয়ত ও শিক্ষার উপর পুর্ণরূপে আমল করে লোকদের জন্য পূর্ণ নমুনা ও আদর্শ স্থাপন করেন। কারণ শরীয়তকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার জন্য মানুষ আদর্শের মুখাপেক্ষী। তারা নবী-রসূলগণের আদর্শকে লক্ষ্য করেই ইবাদত বন্দেগী ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উন্নতি করে এবং স্রষ্টার সঙ্গে প্রগাঢ় সম্পর্ক স্থাপন করে। জাতির বয়স যেহেতু শত শত কখনও হাজার হাজার বৎসর ব্যাপী হয় আর নবী-রসূলগণের বয়স এর তুলনায় অনেক কম হয়; তাই আল্লাহ্ তা'লা নবী-রসূলদের আদর্শ ও আদর্শের ধারাকে জারী রাখার জন্য তাদের মৃত্যুর (অন্তর্ধানের) পরে এমন অনেক স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন যাদের মাধ্যমে নবী-রসূলদের আদর্শ ও তাঁদের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে থাকে। ইসলামী পরিভাষায় তাদেরকে খলীফা বলা হয়।

পৃথিবীর বুকে ঐশী রাজ্য ও ঐশী নেযাম প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশতাগণের সম্মুখে সর্বপ্রথম খেলাফতেরই ঘোষণা করেছেন; ইরশাদ হচ্ছে,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

অর্থাৎ, **স্মরণ কর সেই সময়কে যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদেরকে বললেন, 'আমি পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করতে চলেছি।'** *(সূরা আল বাকারা: ৩১)*

হযরত আদম (আ.) নবী হওয়া সত্ত্বেও তাকে **'খলীফা'** বলে আখ্যায়িত করার পিছনেও গূঢ় তত্ত্ব রয়েছে। নবুয়্যতকাল অপেক্ষা খেলাফতকাল দীর্ঘস্থায়ী। বস্তুতঃ নবুয়্যতের মাধ্যমে সত্যের বীজ বপন করা হয় এবং খেলাফতের মাধ্যমে তা অঙ্কুরিত হয় এবং বিস্তৃত শাখা-প্রশাখায় ফুলে-ফলে সুশোভিত হয় এবং বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ কিতাব **'আল-ওসীয়্যতে'** ইরশাদ করেছেন-

"বস্তুত আল্লাহ্ তা'লা দুই প্রকার কুদরত বা শক্তি (মহিমা) প্রকাশ করেন; **প্রথমত:** নবীগনের যুগে তাঁর শক্তির এক হাত প্রদর্শন করেন। **দ্বিতীয়ত:** অপর হাত এমন সময় প্রদর্শন করেন যখন নবীর মৃত্যুর পর বহু বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করে মনে করতে থাকে যে, এই নবীর কার্য ব্যর্থ হয়ে গেছে। তখন তাদের এই প্রত্যয় হয় যে, এই জামা'ত ধরাপৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এমনকি জামা'তের লোকগণও চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং তাদের কটিদেশ ভেঙ্গে পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়; তখন আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় তাঁর মহাশক্তি প্রকাশ করেন এবং বিপর্যয়মুখী জামা'তকে রক্ষা করেন।" *(আল ওসীয়্যত, পৃষ্ঠা: ৬)*

যখন থেকে আল্লাহ্ তা'লা দুনিয়াতে নবুয়্যতের নিয়ম প্রচলিত করেছেন তখন থেকে তার সঙ্গে খেলাফতের ধারা প্রবর্তন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে নবুয়্যত ও খেলাফত একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং একই দেহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে সংযুক্ত। খেলাফত ছাড়া কখনও নবুয়্যত প্রবর্তিত হয়নি এবং নবুয়্যত ছাড়া কখনও কোন খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নবী করীম হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

مَا كَانَتْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلَّا تَبِعَتْهَا خِلَافَةٌ

অর্থাৎ, **প্রত্যেক নবুয়্যতের পর অবশ্যই খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।** *(কানযুল উম্মাল)*

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী শ্রেষ্ঠ উম্মত মুসলিম জাতিকেও খেলাফত দান করার জোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

অর্থাৎ, **তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেরূপে তিনি তাদের পূর্ববর্তীগনকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন এবং নিশ্চয় তিনি তাদের সেই দ্বীনকে সুদৃঢ় করবেন যাকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং নিশ্চয় তিনি তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর তাকে তাদের জন্য শান্তিতে পরিবর্তন করে দিবেন; তারা আমার ইবাদত করবে এবং কোন বস্তুকে আমার সাথে শরীক করবে না; এরপর যারা অস্বীকার করবে তারা দুষ্কৃতিপরায়ণ বলে সাব্যস্ত হবে।** *(সূরা আন নূর: ৫৬)*

এই আয়াতে ইস্তেখলাফে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামে খেলাফত প্রতিষ্ঠার জোর প্রতিশ্রুতি দান করেছেন এবং তার প্রকার, পদ্ধতি, উদ্দেশ্য এবং কল্যাণসমূহ বর্ণনা করেছেন।

এ আয়াতের لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ শব্দে আল্লাহ্ তা'লা পর পর দুটি তাকীদবোধক অক্ষর **'লামে তাকীদ'** ও **'নুনে সাকীলা'** ব্যবহার করে শক্ত প্রতিশ্রুতি দান করেছেন যে, তিনি অবশ্যই অবশ্যই মোমেনদের মধ্যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন। এটি দ্বারা পুর্বল্লেখিত উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় যে, নবুয়্যতের সঙ্গে খেলাফত ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং একে অপরের জন্য অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু খেলাফত সম্বন্ধে এই ঐশী প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মুসলমানদের ঈমান ও নেক আমলের শর্তকে সংযুক্ত করে এর প্রতিও নির্দেশ করা হয়েছে যে, প্রথম পর্যায়ে নবী করীম (সা.)-এর শিক্ষা ও তরবীয়তের ফলে মুসলমানগণ অবশ্যই অবশ্যই ঈমান ও নেক আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যাতে খেলাফতের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়। যেহেতু ঈমান ও নেক আমল মানুষের ইখতেয়ারের বিষয় যা কোন সময় হ্রাস এবং কোন সময় বৃদ্ধি এবং কোন সময় বিলুপ্ত হতে পারে এই জন্য এই শর্ত রেখে বলা হয়েছে যে, যতদিন পর্যন্ত মুসলমান ঈমান ও নেক আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত খেলাফতের নেয়ামতও তাদের মধ্যে প্রবর্তিত থাকবে; এবং যখন তারা ঈমান ও নেক আমলের পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়বে তখন তারা খেলাফতের নেয়ামত হতেও বঞ্চিত হয়ে পড়বে।

অতএব মুসলমানদের মধ্যে খেলাফতে রাশেদার পদ্ধতিতে খেলাফত বিদ্যমান থাকলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, মুসলিম জাতি সঠিক ঈমান ও নেক আমলের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যদি মুসলমানদের মধ্যে খেলাফত বিদ্যমান না থাকে তাহলে এটিই প্রতিপন্ন হবে যে মুসলমানগন ঈমান ও নেক আমলের সঠিক পথ হতে বিচ্যুত।

مِنْ قَبْلِهِمْ এবং كَمَا শব্দদ্বয় এই ব্যাখ্যা করছে যে, মুসলমানদেরকে যে ইসলামী খেলাফত দান করা হবে তার নিয়ম, পদ্ধতি ও স্বরূপ হবে পূর্ববতী জাতিসমূহে প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের নিয়ম, পদ্ধতি ও স্বরূপ মোতাবেক। যেমন **হযরত মুসা (আ.)**-এর পর ও **হযরত ঈসা (আ.)**-এর পরে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ শব্দগুলো দ্বারা খেলাফতের মহৎ উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ খলীফার মাধ্যমে **'দ্বীন ইসলাম'** তার প্রকৃত শিক্ষা ও স্বরূপসহ মূলভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا শব্দগুলি দ্বারা খেলাফতের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের প্রতি নির্দেশ করছে যে, উম্মতের উপর নানা প্রকার ভয়-ভীতির সময় আসবে কিন্তু খেলাফতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাকে শান্তিতে পরিবর্তন করে দিবেন এবং খলীফার মাধ্যমে নিজ রহমত ও ফযলের নিদর্শনাবলী প্রকাশ করবেন।

يَعْبُدُونَنِي শব্দগুলো স্পষ্ট নির্দেশ করছে যে, ইসলামী খেলাফতের মাধ্যমে অবাধে ও নির্বিঘ্নে আল্লাহ্র ইবাদত পালন করার পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে; যেখানে কোন ব্যক্তি ভয়-ভীতি, বল প্রয়োগ এবং চাপের সম্মুখীন হয়ে ইবাদত করবে না বরং স্বেচ্ছায় ও বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করবে।

لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا শব্দগুলি স্পষ্ট নির্দেশ করছে যে, ইসলামী খেলাফতের মাধ্যমে ব্যক্ত ও গুপ্ত সকল রকমের শিরক ও অংশীবাদিতার মূলোৎপাটন করা হবে এবং নির্মল তওহীদ প্রতিষ্ঠিত হবে।

وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত খেলাফতকে যারা অস্বীকার করবে তারা দুষ্কৃতিপরায়ণ এবং অবাধ্য বলে পরিগণিত হবে।

নবী করিম (সা.)-এর মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয় কুদরতের নিদর্শন **হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.)**-এর দ্বারা সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হয়েছে।

**'দ্বিতীয় কুদরত'** অর্থাৎ খুলাফায়ে রাশেদার মাধ্যমে দ্বীনে ইসলাম কেবল তার সঠিক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং তাদের নেতৃত্বাধীন ইসলাম বহিঃজগতে বিস্তার ও প্রসার লাভ করেছে। ফলশ্রুতিতে কয়েক বৎসরের মধ্যে সিরিয়া, ইরাক,

মিশর, রোম ও ইরান প্রভৃতি অঞ্চলে ইসলামের অগ্রগতির ঢেউ মধ্য– এশিয়ার পরে আফ্রিকা ও ইউরোপের প্রান্তদেশসমূহে এবং চীনের সুউচ্চ প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরূপে খেলাফতের নেতৃত্বে তৎকালীন গোটা সভ্য জগৎ ইসলামের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে।

ইসলামী খেলাফতের সংক্ষিপ্ত স্বরূপ বর্ণনা করার পর এই সম্পর্কে নবী করীম (সা.)-এর একটি অত্যাধিক জরুরী ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ না করলে বিষয়বস্তু অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন-

**"আল্লাহ্ তা'লা যতদিন চাবেন ততদিন তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত থাকবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। তা ততদিন থাকবে যতদিন আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। যার পর ধ্বংসকারী (অর্থাৎ অত্যাচার নিপীড়ণের) রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যতদিন আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন তা থাকবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন যার পর অহংকার ও বল প্রয়োগের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যতদিন আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন তা থাকবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন; অতঃপর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর তিনি (সা.) চুপ হয়ে গেলেন।"** *(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল ও বায়হাকী)*

নবী করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য হতে বর্ণিত হয়েছে যে, খেলাফতে রাশেদা ত্রিশ বৎসরকাল বিদ্যামান থাকবে। নবী করীম (সা.)-এর এই তাৎপর্য্যপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীটি আশ্চর্যজনকভাবে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী খেলাফতে রাশেদা কায়েম থাকল। হযরত মোয়াবিয়ার পর হতে ইসলামী নিয়ম ভঙ্গ করে বাদশাহাত (রাজত্ব) কায়েম করা হল। ইতিহাস সাক্ষী যে, যদিও তৎকালীন শাসনব্যবস্থা বাদশাহাতের পদ্ধতিতে প্রচলিত হয়েছিল কিন্তু মুসলমানগণ ও রাষ্ট্রপতিগণ সকলে স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, সূরা নূরের আয়াতে ইস্তেখলাফ অনুযায়ী তারা খাঁটি মুসলমান হয়ে থাকলে খাঁটি ঈমান ও আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকলে এর ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের মধ্যে অবশ্যই খেলাফত বিদ্যমান থাকতে হবে, তাই বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাসীয়ার রাষ্ট্রপতিগণ নিজেদেরকে কখনও মুলুক বা বাদশাহ বলে আখ্যায়িত করত না বরং তারা নিজেদেরকে আমীরুল মু'মিনীন বা খলীফাতুল মুসলিমীন বলেই অভিহিত করত।

মুসলমানদের অধঃপতনের সময়েও একপর্যায়ে সিন্ধু দেশ হতে স্পেন পর্যন্ত বিশাল মুসলিম রাষ্ট্রটি যখন বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়লো তখনও বাগদাদের আমীরকে সকল রাষ্ট্রপতি খলীফাতুল মুসলেমীন বলে আখ্যায়িত করতো। কোন রাষ্ট্রপতি সিংহাসনে আরোহন করলে বাগদাদস্থ খলীফাতুল মুসলেমীন হতে সনদ গ্রহণ করতে হত এবং তার নামে তাকে মুকুট পড়ানো হত, তার নামে সকল দেশে জুমুআ ও ঈদের খুৎবা ইত্যাদি পড়া হত। ১৯২৪ ইং সালে মুস্তফা কামাল পাশা মুসলমানদের শেষ খলীফা **'আব্দুল হামীদ'**কে খেলাফতচ্যুত করে চিরতরে ইসলামী খেলাফতকে নিঃশ্চিহ্ন করে দেয়। পরে মুসলমানগণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে আন্দোলন চালায়। কিন্তু তারা শত চেষ্টা ও আন্দোলন করেও শৃঙ্খলকে আর কায়েম করতে পারেনি। কারণ আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা অন্য কিছু ছিল এবং তা ছিল নবী করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী **'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়্যত'** অর্থাৎ ইসলামের অধঃপতনের পর তার পুনরুজ্জীবনের সময় নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। মিশকাতে উক্ত হাদীসের অংশ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে,

"এটি দ্বারা ঈসা ও মাহদী (আ.)-এর যামানা বুঝায়। স্পষ্টই বুঝা গেল যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমে শরীয়তবিহীন উম্মতী নবুয়্যত কায়েম হওয়ার পর খেলাফতে ইসলামীয়া প্রতিষ্ঠিত হবে যার শৃঙ্খল কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। কারণ, শব্দদ্বয় নির্দেশ করছে যে সেই **'খেলাফত আলা মিনহাজে নবুয়্যত'** প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাতে আর কোন ব্যতিক্রম ঘটবে না। তাই আঁ হযরত (সা.) চুপ হয়ে গেলেন।"

আল্লাহ্ তা'লা নিজ প্রতিশ্রুতি এবং তাঁর রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঠিক সময়ে ইসলামের পুনঃর্জাগরণের জন্য **হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানীকে** মসীহ্ মাওউদ ও মাহদীয়ে মা'হুদ করে আবির্ভূত করলেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর মৃত্যুর পর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্বন্ধে নিজ কিতাব **'আল ওসীয়্যতে'** জামা'তকে সম্বোধন করে বলেছেন, **"হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল হতে আল্লাহ্ তা'লার এই বিধান রয়েছে যে, তিনি দুটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দুটি মিথ্যা উল্লাস ব্যর্থ করে দেখান, এমতাবস্থায় এখন সম্ভবপর হতে পারে না যে, আল্লাহ্ তা'লা**

**তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা চিন্তিত হবে না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়, কারণ তোমাদের পক্ষে দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন, এবং এর আগমন তোমাদের পক্ষে শ্রেয় কারণ তা স্থায়ী, তার ধারাবাহিক শৃঙ্খল কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না।"**

কুরআনের বিবরণ অনুযায়ী জামা'ত হিসেবে মু'মিনদের সত্যিকার ঈমান ও নেক আমলের মাপকাঠি হল খেলাফত। খোলাফায়ে রাশেদীনের পদ্ধতিতে সঠিক ইসলামী খেলাফত ধরাপৃষ্ঠে বর্তমানে কেবল জামা'তে আহমদীয়ার মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। রয়েছে কেন্দ্র, রয়েছে বায়তুল মাল আর রয়েছে মজলিসে শূরা। দ্বিতীয় কুদরতের নিদর্শন খেলাফতের মাধ্যমে আজ ইসলাম অপ্রতিরোধ্য গতিতে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং দ্বীপ ও উপদ্বীপসমূহে বিস্তার লাভ করছে। খেলাফতের নেতৃত্বে বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, শত শত মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে, স্কুল-কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং এই খেলাফতের বরকতে আল্লাহ্ তা'লা কবুলিয়তে দোয়ার অজস্র নিদর্শন প্রকাশ করছেন। খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হতে আজ প্রায় একশ বছর ধরে জামা'তের উপর সামগ্রিকভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে মহাবিপদাবলী এবং অগ্নিপরীক্ষার সময় আল্লাহ্ তা'লা বিশেষ রহমত ও ফযল নাযেল করে স্বীয় প্রবল কুদরত ও মহীমার জ্বলন্ত নিদর্শন প্রকাশ করে যাচ্ছেন। যার ফলে প্রত্যহ মৃতগণ নবজীবন লাভ করছে, বধীরগণ শ্রবণশক্তি অর্জন করছে এবং অন্ধগণ দৃষ্টিশক্তি লাভ করে চক্ষুষ্মাণ হচ্ছে। বরকতমন্ডিত তারা, যারা আল্লাহ্ তা'লার প্রবল কুদরতের নিদর্শন খেলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে জীবন্ত ও ফলবান বৃক্ষের শাখা-উপশাখায় পরিণত হয়।

# কুদরতে সানীয়া

**সফিক আহমদ চৌধুরী**
ছাত্র ৬ষ্ঠ বর্ষ, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

সৃষ্টি করলেন যিনি এই যমীন ও আসমান,
আপন কুদরতে তিনি সদা মূর্তিমান।
বান্দারে দেখাইতে তাঁর কুদরতের জ্যোতি,
নবী-রসূল করলেন প্রেরণ বান্দাদের প্রতি।

রসূল প্রেরণ খোদার কুদরতের প্রথম প্রকাশ,
যার মাধ্যমে বান্দা পায় তাঁহারও সকাশ।
রসূল শোনান খোদার বাণী বান্দাদেরকে ডাকি,
কিছু নাদান বলে ওঠে খোদা আছে নাকি?

খোদারে চিনিয়া ফেলে যার অন্তরের দৃষ্টি,
তার হৃদয়ে বর্ষিত হয় রহমতের বৃষ্টি।
খোদা রসূলেরে করেন যখন 'রাফা' তাঁরই দিকে,
কাফেররা তখন আনন্দিত হয় শয়তানী আঙ্গিকে।

ভাবে তারা খোদার তরী গেল তবে ডুবে,
তখনই দিবাকর উঁকি মারে দামেস্কেরও পূবে।
থাকে তারা উদগ্রীব হয়ে দেখিতে অমাবস্যা,
চতুর্দশী হয় উদিত, মিটে যায় সব তপস্যা।

মাহদী বলেন ডেকে বান্দা, দেখিতে কুদরতে সানী,
দোয়া করো মিলে সবে, শুনিবেন অন্তর্যামী।
যখন খোদা কবুল করলেন বান্দাগণের দোয়া,
আসমান-যমীন পাইল তখন কুদরতে সানীয়ার ছোঁয়া।

বরকতমন্ডিত করলেন খোদা কুদরতে সানীয়াকে,
রহমতের চাদর আবৃত রাখে ঐশী খেলাফতকে।
এই যুগে পাইতে হলে সত্য খোদার দিশা,
অন্তর হতে দূর করো বান্দা সকল অমানিশা।

পথ একটাই, এক হও সবে ঐশী পতাকাতলে,
'খেলাফতে আহমদীয়া' জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বলে!

# হাদীসের আলোকে আহমদীয়া খেলাফত

মাওলানা সালেহ আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

অর্থাৎ তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, নিশ্চয় তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেরূপে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন এবং নিশ্চয় তিনি তাদের সেই ধর্মকে সুদৃঢ় করবেন যাকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং নিশ্চয় তিনি তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর তা তাদের জন্য শান্তিতে পরিবর্তন করে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে আর অন্য কোন কিছুকে আমার সাথে শরীক করবে না। এরপর যারা অস্বীকার করবে তারাই দুষ্কৃতি পরায়ন বলে সাব্যস্ত হবে। *(সুরা আন নূর: ৫৬)*

আল্লাহ্ তা'লা নবীর ওপর ঈমান আনয়নকারীদের সাথে অঙ্গীকার করেছেন **(১) নবীর মৃত্যুর পর আমি তোমাদের মাঝে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবো। (২) তোমাদের জন্য মনোনীত ধর্মকে সুদৃঢ় করবো। (৩) তোমাদের ভয় ভীতির অবসান করবো (৪) তোমরা ইবাদত করবে এবং শিরক থেকে মুক্তি পাবে (৫) আর যারা খেলাফত কে অস্বীকার করবে তারা দুষ্কৃতি পরায়ন বলে সাব্যস্ত হবে।**

খলীফা আরবী শব্দ। **'খলফ'** হতে খলীফা শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ **স্থলাভিষিক্ত**। একজন চলে গেলে যে তার স্থান প্রাপ্ত হন তিনি তার খলীফা বলে পরিচিত হন। নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর কুদরতের এক হাত প্রদর্শন করেন। নবী যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন নবীর বিরোধীরা এই ভেবে আনন্দিত হয় যে, এখন নবীর মৃত্যুর সাথে সাথে তার প্রতিষ্ঠিত জামা'তও শেষ হয়ে যাবে। এমন পরিস্থিতিতে মু'মিনরা যখন ঘাবড়ে যায় তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর কুদরতের দ্বিতীয় হাত প্রদর্শন করেন। তিনি নবীর স্থলাভিষিক্ত হিসাবে খলীফা নিযুক্ত করেন। নবী যে আধ্যাত্মিক বাগান তৈরি করে গিয়েছেন তিনি তার পরিচর্যা করেন এবং শুশোভিত বাগানে পরিণত করেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর আমরা খেলাফতে রাশেদার যুগ দেখতে পাই। তারা মহানবী (সা.)-এর সৃষ্ট বাগানকে লালন পালন করে সুশোভিত বাগানে পরিণত করেন। এসব কিছু আমাদের ইসলামের স্বর্ণযুগ স্মরণ করিয়ে দেয়।

কুরআনের এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের সাথে এমন এক অঙ্গীকার করেছেন যা কিয়ামতকাল পর্যন্ত পূর্ণ হতে থাকবে। কিন্তু তা কিভাবে এবং কখন হবে সে সম্পর্কে কুরআনের অন্যত্র এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

অর্থাৎ তিনিই নিরক্ষরদের মাঝ থেকে তাদেরই একজনকে এক মহান রসূল হিসেবে আবির্ভূত করেছেন। সে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শুনায়, তাদের পবিত্র করে এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিখায়। অথচ এর পূর্বে তারা নিশ্চয় সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় (নিপতিত) ছিল। আর তাদেরই মাঝ থেকে অন্যদের প্রতিও (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন), যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয় নি। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়। এ হলো আল্লাহ্‌র

অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান তা দান করেন। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহের অধিকারী। *(সূরা আল জুমু'আ: ৩-৫)*

এই আয়াত সম্পর্কে নিজের কোন ব্যখ্যা না দিয়ে, আসুন মহানবী (সা.) এ আয়াতের কি ব্যখ্যা করে গেছেন তা শুনি। এই আয়াতের অবতরণ সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন,

عن ابی هریرة قال کنا جلوسا عند النبی صلی الله علیه و سلم قال فانزلت علیه سورة الجمعة ، و اخرین لما یلحقوا بهم - قلت من هم یا رسول الله فلم یراجعه حتی سال ثلاثا و فینا سلمان الفارسی وضع رسول الله صلی الله علیه و سلم یده علی سلمان ثم قال لو کان الایمان عند الثریا لنا له رجال او رجل من هؤلاء-

অর্থাৎ আমরা হযরত নবী করীম (সা.)-এর নিকট বসে ছিলাম। তখন সূরা জুমু'আ যার মধ্যে **'ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম'** আয়াত আছে, অবতীর্ণ হলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল! তারা কারা (যারা এখনও আমাদের সাথে মিলিত হয় নাই)? কিন্তু তিনি (সা.) এর উত্তরে নীরব রইলেন। এমনকি তিনবার জিজ্ঞাসা করা হলো। সে সময় সালমান ফারসী আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ (সা.) সালমান ফারসীর উপর হাত রাখলেন এবং বললেন, ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে চলে গেলেও তাদের (অর্থাৎ পারশ্য বংশোদ্ভুত) এক বা একাধিক ব্যক্তি সেখান হতে তা নামিয়ে আনবে। *(বুখারী, কিতাবুত তাফসীর)*

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস আমাদের বলে দিচ্ছে, মহানবী (সা.)-এর পর আবার এমন এক সময় আসবে যখন ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে চলে যাবে। সে সময় পারশ্য বংশোদ্ভুত এক বা একাধিক ব্যক্তি ঈমানকে সেখান হতে নামিয়ে আনবে। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে ঈমান বিলুপ্ত হয়ে যাবে আর সেই হারানো ঈমানকে সেই পারশ্য বংশোদ্ভুত এক বা একাধিক ব্যক্তি পৃথিবীতে নামিয়ে আনবে।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন,

یاتی علی الناس زمان لا یبقی من الاسلام الا اسمه و لا یبقی من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة و هی خراب من الهدی علماؤهم شر من تحت ادیم السماء من عندهم تخرج الفتنة و فیهم تعود-

অর্থাৎ মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন ইসলামের কেবলমাত্র নাম এবং কুরআনের শুধু অক্ষরগুলো অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলো বাহ্যিকভাবে আড়ম্বরপূর্ণ হলেও হেদায়াতশূণ্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিচে সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য হতে ফিত্না-ফাসাদ সৃষ্টি হবে এবং তাদের মধ্যেই তা ফিরে যাবে। *(বায়হাকী, মিশকাত)*

তিনি (সা.) আরো বলেছেন,

تَكُوْنُ النُّبُوَّةُ فِيْكُمْ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَكُوْنَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا اِذَا شَاءَ اَنْ يَّرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةٌ عَلٰى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ، فَتَكُوْنُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَكُوْنَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا اِذَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا عَاضًّا ' فَيَكُوْنُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَكُوْنَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا اِذَا شَاءَ اَنْ يَّرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً ' فَتَكُوْنُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَكُوْنَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا اِذَا شَاءَ اَنْ يَّرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةٌ عَلٰى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ (مسند احمد- بیهقی- مشکوٰة)

অর্থাৎ **হযরত নু'মান বিন বশীর হযরত হুযায়ফা হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, এরপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। তা ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, এরপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন তা এক অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, এরপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নিবেন, তখন নবুয়্যতের পদ্ধতিতে পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। মহানবী (সা.) এরপর নীরব হয়ে যান।** *(মুসনাদ আহমদ, বায়হাকী, মিশকাত)*

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীস হতে প্রমাণিত যে, মহানবী (সা.)-এর পর এই উম্মত এক চরম অধঃপতনের শিকার হবে, তখন কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে পারশ্য বংশোদ্ভুত কোন ব্যক্তির আগমন ঘটবে যার মাধ্যমে ইসলাম পুনরায় জীবিত হবে এবং ইসলামের হারানো গৌরব আবার ধরাপৃষ্ঠে ফিরে আসবে।

এসব ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে মুসলমানদের চরম অধঃপতনের সময় বিশেষ করে দাজ্জালের নীল দংশনে যখন দলে দলে মুসলমান এমনকি বড় বড় আলেম খ্রিষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করতে লাগলো তখন আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর উম্মতকে রক্ষার জন্য তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) কে প্রেরণ করলেন। তিনি (আ.) ১৮৩৫ সনে

জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০৮ সনে ইন্তেকাল করেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর উম্মতকে একত্রিত করার জন্য এবং সমগ্র বিশ্বের মানুষকে এক কলেমার পতাকাতলে সমবেত করার জন্য কাজ করে যান এবং তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে ইহকাল ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই খেলাফতকে আমরা **'খেলাফতে আহমদীয়া'** বলে জানি। হযরত আলহাজ্জ হাফেয মাওলানা হেকীম নুরুদ্দীন (রা.) কুরআন হাদীসের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খেলাফতে আহমদীয়ার প্রথম খলীফা নির্বাচিত হন। বর্তমানে এই খেলাফতের পঞ্চম খলীফা আমাদের মাঝে বিদ্যমান। আর তিনি হলেন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "খোদা তা'লা দুই প্রকারের কুদরত (শক্তি ও মহিমা) প্রকাশ করেন। একঃ নবীদের মাধ্যমে তাঁর শক্তির এক হাত প্রদর্শন করেন । দুইঃ অপর হাত এরূপ সময় প্রদর্শন করেন যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলি উপস্থিত হয় এবং শত্রুরা শক্তি লাভ করে মনে করে যে, এখন নবীর কাজ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তখন তাদের এ প্রত্যয়ও জন্মে যে, এখন জামা'ত ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমনকি জামা'তের লোকজনও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন, তাদের কোমর ভেঙ্গে পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়। তখন খোদা তা'লা দ্বিতীয়বার নিজ মহা কুদরত প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন। সুতরাং যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করে তারা খোদা তা'লার এ মু'জিযা দেখতে পায়। যেভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সময় হয়েছিল, যখন আঁ-হযরত (সা.)-এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকালমৃত্যু মনে করা হয়েছিল। বহু মরুবাসী অজ্ঞলোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবারাও শোকাভিভূত হয়ে উন্মাদের মত হয়ে পড়েছিল। তখন খোদা তা'লা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কে দাঁড় করিয়ে পুনরায় তাঁর শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করেন। এমনভাবে তিনি ইসলামকে বিলুপ্তির পথ থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁর দেয়া সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন যা তিনি দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا

অর্থাৎ– **'এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর একে তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন'।** *(সূরা আন নূর: ৫৬)*

হযরত মূসা (আ.)-এর সময়ে এমনই হয়েছিল। অনুরূপ ঘটনা হযরত ঈসা (আ.)-এর সময়েও ঘটেছিলো। ক্রুশের ঘটনার সময় তাঁর সব শিষ্য বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের একজন ধর্মচ্যুত হয়েছিলো। অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহ্ তা'লার বিধান হচ্ছে, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং খোদা তা'লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন এটা সম্ভবপর নয়। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা এটি স্থায়ী, এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু যখন আমি চলে যাবো, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে। যেহেতু **'বারাহীনে আহমদীয়া'** গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদা তা'লা বলেছেন:

میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔

অর্থাৎ- **"আমি তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর প্রাধান্য দিব।"**

সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন এরপর সেই চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত দিবস এসে যায়। আমাদের খোদা প্রতিশ্রুতি পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি তাঁর অঙ্গীকারকৃত সব কিছুই তোমাদেরকে দেখাবেন। যদিও বর্তমান যুগ পৃথিবীর শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ রয়েছে যা এখন অবতীর্ণ হবার সময়, তবুও সেই সব বিষয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ দুনিয়া অবশ্যই কায়েম থাকবে, যার সম্বন্ধে খোদা সংবাদ দিয়েছেন। আমি খোদার পক্ষ থেকে এক প্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পরে আরো কয়েকজন ব্যক্তি যাঁরা দ্বিতীয় বিকাশ হবেন। অতএব, তোমরা খোদার কুদরতে সানীয়ার (দ্বিতীয় কুদরত) অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাক।" (পুস্তক আল-ওসীয়্যত)

আলহামদুলিল্লাহ্ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পূর্ণ

হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর **হযরত হেকীম নূরুদ্দীন (রা.)** খলীফা নিযুক্ত হলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরোধীরা আনন্দিত হলো। তারা বললো **"যে ব্যক্তি খলীফা হয়েছে সে তো শুধু মসজিদে বসে কুরআনের দরস দিতে পারবে। এ জামা'ত শেষ হয়ে যাবে। এ কথা শুনে খলীফা আউয়াল (রা.) আনন্দিত হয়ে বললেন আমার কাজ তো এটিই।"** পৃথিবীবাসী স্বাক্ষী তার এই কুরআনের দরস আজ সারা বিশ্বে আহমদীয়াত ছড়িয়ে দিয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ এ কুরআনের আলোতে আলোকিত হয়ে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য করে পৃথিবীবাসীর জন্য আদর্শ হয়েছে এবং হচ্ছে।

বস্তুত খেলাফতের সাথে শান্তি সম্পর্কযুক্ত, ঈমান সম্পর্কযুক্ত, আমলে সালেহ সম্পর্কযুক্ত এবং দ্বীন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কযুক্ত।

প্রত্যেক খলীফার যুগে এমনটিই হয়েছে। আমরা **হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)**-এর মৃত্যুর সময়ও দেখেছি। মনে হচ্ছিল আমরা সবাই এতিম হয়ে গিয়েছি। ভয়-ভীতির অবস্থা বিরাজ করছিল। কিন্তু যখন **খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)** আমাদের সামনে দাঁড়ালেন ও আমাদের বয়াত নিলেন তখন প্রতিটি আহমদীর হৃদয় শান্তিতে ভরে গেল এবং ভয়-ভীতির অবসান হলো। তিনি তার বাণী ও খুতবার মাধ্যমে আমাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করছেন, আমলে সালেহ করাচ্ছেন। কুরআন ও কুরআনের বাহকের ওপর যে কোন আক্রমনের সামনে বুক পেতে দিচ্ছেন ও আহমদীদেরকে তাদের করনীয় সম্পর্কে নির্দেশনা দিচ্ছেন। ইসলামের এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার ওপর আক্রমন প্রতিহত করছেন এবং তার জামা'তকে নির্দেশনা দিচ্ছেন ।

হে খোদা আমরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। **ইয়ে রোজ কার মুবারাক সুবহানা মাই-ইয়ারানি**। হে আল্লাহ্ তুমি আমাদেরকে এই নেয়ামতকে আঁকড়ে ধরে রাখতে সাহায্য কর। আমাদের খেলাফতের হেফাযত করার তৌফিক দাও এবং আমাদের শেষ নিঃশ্বাস যেন খেলাফতের দাসত্বে নির্গত হয়। (আমীন)

# উৎসর্গ

**মুহাম্মদ সমিউল ইসলাম**
ছাত্র: ৪র্থ বর্ষ, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

এসেছি এখানে স্বপ্ন নিয়ে আমি,
দোয়া কর, যেন হই সফল আমি।
রঙ্গিন স্বপ্নগুলো করছে এখনো তাড়া,
প্রভু যেন নিজ হাতে দেয় মোরে ধরা।

খোদারে স্বপেছি প্রাণ বাঁচিতে ওরে,
আখিরাতে ঠাই যেন হয় তোমারই তরে।
ভালো কিছু এনে দাও মোরে স্বর্গ থেকে,
মন্দটা কাড়িয়া লও মোর 'কলব ' থেকে।

ক্ষমা করে দাও মোরে আছে যত পাপ,
দয়াময় খোদার তরে এইতো মনোতাপ।
যতকাল রবে এই রক্তে মাংসে গড়া দেহে প্রাণ,
তোমারই গুণের তরে হই যেন আগুয়ান।

জগৎবাসীর সম্মুখে যেন আমি,
গুনকীর্তনে তোমারই হই অগ্রগামী।
তোমার শান, গুণ, মাকাম ও মর্যাদা নিয়ে,
দূর্গম পথ পাড়ি দিয়ে যাবো এগিয়ে।

ধরাধামে উঁচিয়ে ধরবো ইসলামের শান,
চারিপাশে মুখরিত যেন হয় তোমারই নাম।

# আল্লাহ্ তা'লার সাথে ঐশী সম্পর্কের প্রমাণ

**মাওলানা জাফর আহমদ**
**শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ**

পৃথিবীর মানবজাতির সংশোধনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা নবী বা রসূল প্রেরণ করেন, তারাও তাঁর সাথে এক প্রকার গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক রাখেন। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র মানবজাতির হেদায়াতের জন্য যাঁকে প্রেরণ করেছেন তিনি হচ্ছেন হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এবং তাঁর পরে স্থলাভিষিক্ত খলীফাগণ আল্লাহ্ তা'লাকে কতটুকু ভালোবাসতেন আর তাদের সেই ভালোবাসার দরুণ আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে কী আচরণ করেছেন এর কয়েকটি ঘটনা প্রিয় পাঠকের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। আশাকরি এ সকল সত্য ঘটনার মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাদের ঐশী সম্পর্কের গভীরতা কিছুটা হলেও অনুধাবন করতে পারব, যা আমাদের ব্যক্তিজীবনে ঈমান ও আমলের উন্নতির কারণ হবে, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লার এ সকল প্রিয় মানুষেরা জীবনের কোন একটি মুহূর্তেও না কোন মানুষের উপর ভরসা করেছেন আর না কোন উপকরণের উপর ভরসা করেছেন বরং যে কোন পরিস্থিতিতেই সর্বদা এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চেয়েছেন এবং তাঁর উপরই পরিপূর্ণ ভরসা করে জগতের সামনে উত্তম দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন এবং রেখে যাচ্ছেন।

**হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)** নামাযের বিষয়ে এত মনযোগী ছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কাকুতি মিনতির সাথে দোয়া করার মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ না করতেন ততক্ষণ তিনি তাঁর মাথা সিজদা থেকে উঠাতেন না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজে লিখেন, 'আমি একবার বাটালায় একটি মামলার কাজে গেলাম। আদালতে মামলার কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে যোহরের নামাযের সময় হলে আমি নামায পড়ার জন্য চলে যাই এবং নামায পড়া আরম্ভ করি। মামলার শুনানীর জন্য আমাকে ডাকা হয় কিন্তু আমি তো নামায পড়তে চলে যাই। আমার প্রতিপক্ষ হাজির হয়ে এক তরফা নিজের পক্ষে সিদ্ধান্ত করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং এ বিষয়ে অনেক চেষ্টা প্রচেষ্টা করে। কিন্তু বিচারক কোন প্রকার তোয়াক্কা না করে আমার পক্ষে রায় দিয়ে দেন। আমি যখন নামায শেষ করলাম তো আমার মনে হলো বিচারক হয়ত আমার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু আমি যখন উপস্থিত হয়ে বিচারককে বললাম 'আমি তো নামায পড়ছিলাম।' বিচারক উত্তরে আমাকে বলেন, 'আমি তো আপনার পক্ষে রায় দিয়ে দিয়েছি।'

আদালতে উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পক্ষে রায় দেয়া আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একটি ঐশী নিদর্শনেরই বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু না। কেননা তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্তার ইবাদতে ব্যস্ত ছিলেন।

**হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)** বর্ণনা করেন, আমাকে কাজী মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব (রা.) বলেন 'একবার কাদিয়ানে এক ব্যক্তি তার ছেলেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিকট সাক্ষাতের জন্য নিয়ে আসে। সেই ছেলে সম্মানের জন্য নিজ হাত দ্বারা হুযূর (আ.)-এর পদযুগল স্পর্শ করতে গেলে হুযূর (আ.) নিজ হাত দ্বারা তাকে বাঁধা দিয়ে বলেন- **'আল্লাহ্র নবী পৃথিবী থেকে শিরক মিটানোর জন্য আসেন নাকি শিরক প্রতিষ্ঠার জন্য?'** কিন্তু আজকাল উম্মতে মুসলেমার এক শ্রেণির লোক আছে যাদেরকে পা ধরে সালাম না করলে অসম্মান মনে করা হয়। যেটির সাথে ইসলামের কোন দূরতম সম্পর্ক নেই, কেননা মাথা কেবলমাত্র এক অ-দ্বিতীয় আল্লাহ্র সামনেই অবনত করার শিক্ষা আমাদেরকে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) দিয়ে গেছেন। এ যুগে যার বাস্তবায়ন আমরা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমে দেখতে পাই।

**হযরত মাওলানা হেকীম নুরুদ্দীন (রা.)** যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর ২৭ মে ১৯০৮ সালে প্রকৃত ইসলাম তথা আহমদীয়াতের প্রথম খলীফা নির্বাচিত হন। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সবচেয়ে উত্তম বন্ধু, সবচেয়ে বড় প্রেমিক, সবচেয়ে বেশি প্রিয়, সবচেয়ে বেশি আনুগত্যকারী, সবচেয়ে বেশি আর্থিক কুরবানীকারী এবং সবচেয়ে বেশি সাহায্যকারী ছিলেন। তিনি কুরআন, হাদিস ও ইসলামী বিষয়ে অনেক বড় মাপের একজন আলেম ছিলেন। তিনি আল্লাহ্র প্রতি অতুলনীয় ভরসাকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

**হযরত মাওলানা আলহাজ্ব হেকীম নুরুদ্দীন সাহেব (রা.)-এর তা'ল্লুক বিল্লাহ** অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের দু একটি ঘটনা উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ সাহেব বি.এ বর্ণনা করেন "১৯০৯ সালের দিকের ঘটনা। একবার কাদিয়ানে বেশ কয়েকদিন প্রচুর বৃষ্টি হয়। অতিবৃষ্টির কারণে অনেক বাড়ি-ঘর পড়ে যায় এমন কি হযরত নবাব মোহাম্মদ আলী সাহেব কাদিয়ানের বাহিরে একটি নতুন বাড়ি নির্মাণ করেন, তো এই অতিবৃষ্টির কারণে সেটিও ভেঙ্গে পড়ে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ক্রমাগত বৃষ্টির নবম দিন যোহরের নামাযের পরে বলেন, আমি দোয়া করব আপনারা আমার সাথে কেবল আমীন আমীন বলুন। দোয়া সমাপ্ত করে বলেন আজ আমি সেই দোয়া করেছি যা হযরত রসূল করীম (সা.) সারা জীবনে কেবল একবার করেছেন। তিনি (রা.) যখন দোয়া করছিলেন তখনও মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল কিন্তু দোয়া শেষ করার সাথে সাথে বৃষ্টি থেমে যায় এবং আসরের নামাযের পর আকাশ একেবারে পরিস্কার হয়ে যায় এবং রোদ দেখা দেয়।" এভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয়দের দোয়াকে তাৎক্ষনিক নিদর্শনস্বরুপ কবুল করে জগতের সামনে উপস্থাপন করেন।

হযরত মাওলানা আলহাজ্ব হেকীম নূরুদ্দীন (রা.) বলেন, আমার উপর কখনো বিপদ আপতিত হবে না। **আব্দুল কাদের সওদাগর মল সাহেব** বর্ণনা করেন, তিনি (রা.) কাশ্মিরের মহারাজার দরবারে হেকীম হিসাবে ভাল বেতনের পাশাপাশি বছরের বিভিন্ন সময়ে অনেক তোহফা পেতেন– যার অধিকাংশ তিনি গরিব ছাত্র, অসহায় বিধবা এবং এতীমদের কল্যাণার্থে তাদের অভাব দূর করার জন্য খরচ করতেন। জম্মুতে হাকিম নামে একজন হিন্দু পানসারী ছিলেন তিনি প্রায় সময় মৌলবী সাহেবকে বলতেন, সমস্ত টাকা খরচ না করে কিছু কিছু টাকা জমা করুন। যে কোন সময় বিপদ আসতে পারে। মৌলবী সাহেব সব সময় বলতেন, আল্লাহ্ তা'লা কখনো আমাকে কোন বিপদে ফেলবেন না। যখন মৌলবী সাহেবকে তার পদ থেকে অব্যহতি দেয়া হলো সেই দিন হিন্দু ভদ্রলোক হাজির হয়ে বললেন, আজ তো আপনি আমার কথাকে মানবেন। সে তার কথা শেষ না করতেই রাজ্যের কর্মচারীরা চিঠির সাথে মৌলবী সাহেবের আগের পাওনাসহ নিয়ে আসেন। হিন্দু ভদ্রলোক কর্মচারীদের ভর্ৎসনা করেন। কিছুক্ষণ পরে একজন রানী নিজের পক্ষ থেকে মোটা অংকের টাকা পাঠান এবং নিজের নিকট এর চেয়ে বেশি নেই বলে আফসোস করেন। হিন্দু ভদ্রলোক মৌলবী সাহেবের ঋণের বিষয়টি জানতেন তাই তিনি বলেন কিন্তু আপনি যে ঋণ নিয়েছেন সেই ঋণদাতা তো আপনাকে এত সহজে যেতে দিবে না। একথা বলতে বলতেই ঋনদাতার পক্ষ থেকে লোক এসে বিনয়ের সাথে বলে যে, আপনার বাড়ি যেতে কোন টাকা পয়সা লাগবে কিনা আমার মালিক সেই ব্যবস্থা করার জন্য পাঠিয়েছেন। হিন্দু ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে সেখান থেকে ফেরত চলে যায়। মহান আল্লাহ্ তা'লা এভাবে তার প্রিয় বান্দাদেরকে বিপদের সময় সাহায্য করেন এবং তাদের সম্মান প্রতিষ্ঠিত রাখেন। পরবর্তীতে রাজ্যের পক্ষ থেকেই প্রায় দুই লক্ষ টাকা ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

তারপর ইসলাম তথা আহমদীয়াতের দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হন **হযরত মির্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)**। তিনি ১২ জানুয়ারী ১৮৮৯ সালে কাদিয়ানে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩ মার্চ ১৯১৪ তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ইন্তেকালের পর ১৪ মার্চ ১৯১৪ সালে খেলাফতের আসনে সমাসীন হোন। ছোটবেলা থেকেই তিনি খুব নেক, মুত্তাকী, পরহেযগার এবং সত্যস্বপ্ন দ্রষ্টা ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সম্পর্কে শেখ গোলাম আহমদ ওয়ায়েয (রা.) বর্ণনা করেন, "একদিন আমি নিয়্যত করলাম আজ রাত মসজিদে মোবারকে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে কাটিয়ে দিব। যখন এই নিয়্যতে মসজিদের দরজায় যাই তো দেখি এক বালক সিজদায় পড়ে আকুতি মিনতির সাথে দোয়া করছে। আমি এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়েছিলাম যে আমার পা ব্যথা হয়ে যায় কিন্তু সেই বালক সিজদা থেকে মাথা উঠাচ্ছে না। এমনকি তার দোয়ার প্রভাব আমার উপর পড়তে লাগল আমিও দোয়া করতে থাকলাম হে আল্লাহ্! আমি জানি না এই বালক কে? তুমি তার দোয়াকে কবুল কর। সেই বালক যখন মাথা উঠালো তো দেখি ইনি আমাদের মিয়াঁ সাহেব মির্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.)। আমি তাকে সালাম দিয়ে মুসাফা করলাম এবং তাকে বললাম, মিয়াঁ! আজ আল্লাহ্র নিকট থেকে কি আদায় করে নিয়েছেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমি এই দোয়া করেছি, **'হে আল্লাহ্! তুমি আমার চোখের সামনে ইসলামকে জীবিত করে দেখাও।'** প্রিয় পাঠক! এই ছিল হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর আল্লাহ্র সাথে গভীর সম্পর্কের বাস্তব চিত্র।

**হযরত মেহের আপা (রা.)** বর্ণনা করেন ১৯৫৩ সালের ঘটনা। গরমের সময় ছিল। আহমদীয়াতের বিরোধীতায় তৎকালীন সরকার মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) এবং মির্যা শরিফ আহমদ (রা.)-কে বন্দি করে জেলে পাঠিয়ে দেয়। সেই দিনগুলোতে হুযূর (রা.) পরিবারের লোকদের সাথে বাড়িতে বসে এশার পরে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। মেহের আপা (রা.) বলেন, আমার মুখ থেকে অবলীলায় এ কথা বেরিয়ে আসে 'জানা নেই মিয়াঁ নাসের আহমদ ও মিয়াঁ শরিফ আহমদের এই গরমে জেলখানায় কি অবস্থা?' হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, তারা কোন অপরাধ করে নি, আল্লাহ্ অতি শীঘ্রই তাদের প্রতি রহম করবেন। তারপর তিনি নামাযে দাঁড়ান এবং এমন

আকুতি মিনতির সাথে দোয়া করেন যা আমি ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। একই দৃশ্য তাহাজ্জুদ নামাযেও দেখেছি। তিনি উঁচু আওয়াজে দরদের সাথে দোয়া করছিলেন। পরের দিন সর্বপ্রথম যখন ডাক আসে তাতে এই সু-সংবাদ ছিল যে উভয়ে মুক্তিলাভ করেছেন। মহান আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয় বন্দাগণের দোয়া কত দ্রুত কবুল করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

**হযরত হাফেজ মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)** তিনি ৯ নভেম্বর ১৯৬৫ সালে খলীফা মনোনীত হন। তিনি (রাহে.) ১৯৬৯ সালে জলসার সময় মহিলাদের অধিবেশনে বলেন, "একবার অন্যায়ভাবে আমাকে বন্দি করে জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এমন এক কক্ষে বন্দি করে রাখা হয় যেখানে ফাঁসির আসামীদের রাখা হয়ে থাকে। কোন জানালা নেই, অন্ধকার, বাতাস আসা যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। একটি দুর্গন্ধযুক্ত কম্বল ছাড়া আর কিছুই নেই। রাতে আমার খুব কষ্ট হয়। আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করি এবং বলি, হে আমার আল্লাহ্! আমি চুরি ডাকাতি বা কোন অন্যায় করে এখানে আসিনি। এতে আমার কোন অভিযোগ নেই কেননা তুমি আমাকে কুরবানী করার সুযোগ দিয়েছ। আমি জানি আমি এখানে ঘুমাতে পারব না। এ কথা ভাবতে ভাবতেই আমার চোখ লেগে যায়। আমি কোন অতিরঞ্জিত না করে বলতে পারি যে, আমার এমন অনুভূত হচ্ছিল যেন আমার ঘরে একটি এয়ারকন্ডিশনার লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। যার ফলে এক প্রকার শীতল বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে আর আমি আরামে শুয়ে পড়ি।

**হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)** ১৮ নভেম্বর ১৯২৮ সালে কাদিয়ানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জাগতিক লেখাপড়ার পাশাপাশি জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়া থেকে শাহেদ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৮২ সালে ১০ জুন ইসলাম তথা আহমদীয়া জামা'তের চতুর্থ খলীফা নির্বাচিত হোন। যখন তিনি ছোট ছিলেন তখনই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-কে ইলহাম দ্বারা জানিয়ে দেন তাহের বড় হয়ে খলীফা হবে। দোয়া কবুলিয়াতের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ২০ জুলাই ১৯৮৬ সালের জুমআর খুতবায় বর্ণনা করেন, "ঢাকা বাংলাদেশের একজন আহমদী তার এক গয়ের আহমদী জেরে তবলীগ বন্ধুর আহমদীয়াতের প্রতি আগ্রহের এবং নিয়মিত জামাতের বই পুস্তক পাঠ করার কথা লিখে দোয়ার আবেদন করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তার চোখে সমস্যা দেখা দেয় এবং চোখের জ্যোতি দিন দিন কমে যেতে থাকে। তার চোখের এই রোগের কোন চিকিৎসা নাই বলে ডাক্তারগণ জানিয়ে দেন। সেই গয়ের আহমদীর বন্ধু বান্ধব আত্মীয়-স্বজন তাকে বলে কাদিয়ানীদের বই পড় এ কারণেই তোমার চোখের এই সমস্যা হয়েছে এ কথা বলে হাসি ঠাট্টা করে। তিনি খুব মন খারাপ করে আহমদী বন্ধুকে বিষয়টি জানান। তিনি তাকে সাহস দিয়ে বলেন, আপনিও দোয়া করুন, আমিও দোয়া করছি আর আমাদের প্রিয় ইমামের নিকট দোয়ার জন্য লিখছি ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্ ফজল করবেন। কিছু দিন পর তার চোখের সমস্যা দুরীভূত হতে আরম্ভ করে এবং তিনি সুস্থ্য হয়ে যান। পরবর্তীতে ডাক্তার তার চোখের অবস্থা দেখে বলেন এই কঠিন রোগ কিভাবে ভাল হল। এখন তো চোখে সেই রোগের কোন লক্ষণই অবশিষ্ট নেই।

**হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর তাল্লুক বিল্লাহ** অর্থাৎ খোদা তা'লার সাথে সম্পর্কের একটি ঈমানোদ্দিপক ঘটনা প্রিয় পাঠকগনের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করছি। ৪ মে ২০০৮ সালের বৃহস্পতি বার। হুযূর **'নান্দী- ফিজি'** সফরে ছিলেন। রাত প্রায় আড়াইটার সময় রাবওয়া, লন্ডন এবং পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে ফোন আসতে থাকে যে, টেলিভিশনে সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে একটি অনেক শক্তিশালী **সুনামী** ফিজির পার্শ্ববর্তী দ্বীপ **টোংগোতে** আঘাত হেনেছে। তা শক্তি সঞ্চার করে ফিজি দ্বীপের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, ভোরনাগাদ ফিজিতে আঘাত হানার সমূহ-সম্ভাবনা রয়েছে। আর এটি ইন্দোনেশিয়ার সুনামী থেকেও কয়েকগুণ বেশি শক্তিশালী। ফজরের নামায পড়ার জন্য হুযূর যখন নিজ কক্ষ থেকে বাহিরে আসেন তখন হুযূর (আই.)-কে সম্পূর্ণ ঘটনা অবগত করা হয়। হুযূর (আই.) অত্যন্ত আকুতি মিনতির সাথে দীর্ঘ সেজদাসহ ফজরের নামায আদায় করেন এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র দরবারে হাত উঠিয়ে দীর্ঘ দোয়া করেন। দোয়া শেষ করে উপস্থিত জামাতের সদস্যগণকে বলেন, চিন্তা করবেন না! আল্লাহ্ তা'লা ফযল করবেন। তারপর টেলিভিশনের সামনে যখন বসি, দেখি! সংবাদে বলা হচ্ছে, সুনামীটি নিজ শক্তি হারিয়ে ধীরে ধীরে দূর্বল হতে চলেছে। সকাল হলে সংবাদে বলা হয় সুনামী একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে, ভয়ের কোন কারণ নেই। পরের দিন পত্রিকায় সংবাদ প্রচার হয় এটি একটি জলজ্যান্ত মোযেজা ছিল যা জামাতে আহমদীয়ার খলীফার দোয়ার ফলশ্রুতিতে হয়েছে।

প্রিয় পাঠক! মহান আল্লাহ্ তা'লা যুগে যুগে তাঁর প্রিয়দের দোয়াকে এভাবেই কবুল করে জগতের সামনে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন, করছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত করতে থাকবেন ইনশাআল্লাহ্। মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর দরবারে সেজদাবনত হয়ে সাহায্য প্রার্থনা করার সৌভাগ্য দান করুন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা তার ফেরেশতা দ্বারা আমাদেরকে সাহায্য করুন। (আমীন, সুম্মা আমীন)

# খলীফা আমাদের ‘রক্ষাকবচ’

মাওলানা মাসুম আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

বুখারী শরীফের একটি প্রসিদ্ধ হাদিস দিয়েই লেখা শুরু করতে চাই। রসূলে করীম (সা.) বলেছেন-

اَلْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ

অর্থাৎ **ইমাম ‘ঢালস্বরুপ’ তাঁর পিছনে থেকেই যুদ্ধ করা হয়।**
*(বুখারী)*

ঢালের কাজ কি? ঢাল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের আক্রমন থেকে আমাদেরকে নিরাপদে রাখে। সোজা কথায় ঢাল আমাদের জন্য একটি রক্ষাকবচ। রক্ষাকবচ শব্দটি যখনই আসে তখনি আমাদের মন-মস্তিষ্কে বিভিন্ন বিপদাবলী থেকে নিজেকে রক্ষা করার বিষয়টি উদিত হয়। অর্থাৎ সৃষ্টি জগতের সব সৃষ্টিই নিজেকে রক্ষা করার জন্য যে উপায় উপকরণসমূহকে অবলম্বন করে তাই তার জন্য হয়ে থাকে রক্ষাকবচ। সেই রক্ষাকবচ তাকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন আক্রমন থেকে নিরাপদ রাখে। তাই এই বিষয়টি আমাদের সবার কাছে মোটেই দুর্বোধ্য নয় যে রক্ষাকবচের গুরুত্ব আমাদের জন্য কতটা অপরিসীম। এই সৃষ্টি জগতের সব সৃষ্টিতেই একটি **‘নেযাম’** অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান আর এই ব্যবস্থাপনা সুচারুরুপে তখনি পরিচালিত হয় যখন তাতে একটি নেতৃত্ব থাকে। সমুদ্রের মাছের ঝাঁক থেকে শুরু করে জঙ্গলের হরিন বা বন্যপশুর পাল সবাই নেতার নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়। এমনকি ক্ষুদ্র পিপিলিকা কিংবা মৌমাছিদের মাঝেও আমরা এই নেতৃত্ব দেখতে পাই। আল্লাহ্ তা’লা যেখানে এই পশু-পাখিদের মাঝেই নেতার অধীনে চলার ব্যবস্থাপনা রেখেছেন সেখানে এটি কিভাবে সম্ভব যে মানুষ্যজাতি যাকিনা সৃষ্টির সেরা জীব তাদের মাঝে কোন নেতৃত্ব থাকবে না? এই নেতৃত্বের যে গুরুত্ব কতটুকু তা আমরা জীবজগতের জীবনাচরনের মধ্যেই দেখতে পাই। নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই তারা দলগতভাবে বসবাস করে এবং দলনেতার নির্দেশ মান্য করে চলে। বনের পশুপালের মধ্য থেকে যখনি কোন একজন দলছুট হয়ে যায় তখনি তার উপর নেমে আসে মহাবিপদ। তাই প্রাচীনকাল থেকেই শুধু পশুপাখি নয় বরং আদিমানব থেকে সভ্যমানব সবাই নিজ নিজ জাতির সাথে দলগতভাবে এবং একক নেতৃত্বের অধীনে বসবাস করে আসছে আর তা কেবল তাদের নিজ নিরাপত্তার তাগিদে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক জাতি আরেক জাতির উপর চড়াও হয়েছে বার বার। সুশৃঙ্খল নেতৃত্বের মাধ্যমে যারা লড়াই করেছে তারাই টিকতে পেরেছে।

মানবজাতিতে যে নেতৃত্ব দেখা যায় তা সাধারণত দুই প্রকার। **একঃ** শুধুমাত্র জাগতিক উন্নতি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে জাগতিক নেতার অনুবর্তিতা যেমন– বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন জাগতিক নেতা ও রাষ্ট্রনায়কের সৃষ্টি । **দুইঃ** শুধুমাত্র জাগতিক নয় বরং আধ্যাত্মিক উন্নতি ও নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে এমন নেতার অনুবর্তিতা যাকে সৃষ্টিজগতের জন্য স্রষ্টা স্বয়ং নিযুক্ত করেন। প্রথম প্রকার নেতার গন্ডি ছোট কিন্তু দ্বিতীয়প্রকার নেতার গন্ডি অনেক ব্যাপক। এই দ্বিতীয় প্রকার নেতৃত্বে প্রথম সারিতে রয়েছেন নবী রসূলগণ। আর নবী-রসূলগণের পর তাদের কাজকে এগিয়ে নেওয়ার নেতৃত্বে রয়েছেন তাদেরই খলীফাগণ। সৃষ্টির সূচনা থেকেই এই নেতৃত্ব চলে আসছে, তা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রুপে। কখনো ক্ষুদ্র পরিসরে কখনোবা বৃহৎ পরিসরে।

আল্লাহ্ তা’লা তাঁর মহা সৃষ্টি মানুষের সঠিক দিকনির্দেশনা এবং খোদা তা’লার সাথে সম্পর্কের জন্য যুগে যুগে নবী রসূল পাঠিয়েছেন। তারা এই পৃথিবীতে আগমন করে একদিকে মানবজাতিকে তাদের স্রষ্টার সাথে পরিচিত করিয়েছেন অপরদিকে তাদেরকে জাগতিকভাবেও সভ্য ও উন্নত জীবনের সন্ধান দিয়েছেন। তারা ছিলেন আল্লাহ্ তা’লার প্রতিনিধি অর্থাৎ **খলীফাতুল্লাহ্**। যেমন আল্লাহ্ তা’লা কুরআন করীমে ইরশাদ করছেন- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
অর্থাৎ **‘এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু ফিরিশতাগণকে বললেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি।’**
*(সূরা আল বাকারা: ৩১)*

আবার অন্যত্র হযরত দাউদ (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ

অর্থাৎ **'হে দাউদ! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি।'** *(সূরা সাদ: ৩১)*

অতএব বুঝা গেল নবী রসূলগণও মানবজাতির নেতৃত্ব প্রদান করেন তবে তারা সরাসরি আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন, মানুষের মাধ্যমে নয়।

খেলাফতের আরেকটি ধরণ রয়েছে আর তা হলো **'খলীফাতুর রসূল'** অর্থাৎ রসূলের স্থলাভিষিক্ত বা তার প্রতিনিধি। নবীর মৃত্যুর পর তার খলীফাগণ তার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান। খলীফাগণের মাধ্যমে নবীর আনিত ধর্ম ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে আরো ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। খলীফাগণের মাধ্যমে বিজয়ের অনেক নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়।

নবীর জীবদ্দশায় তার উম্মতের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল নিরাপত্তা বিধান হয় নবীর মাধ্যমে। নবী তার জাতিকে যেভাবে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করেন ঠিক একইভাবে শত্রুদের বাহ্যিক আক্রমনকে প্রতিহত করার জন্যও নেতৃত্ব দেন। এর সবোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই নবীদের সর্দার– খাতামুল মুরসালীন **মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)**-এর জীবনীতে। তিনি (সা.) একাধারে মুসলিম জাতির আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয়প্রকার নিরাপত্তা বিধান করেছেন। যেভাবে **বদর, ওহুদ** ও অন্যান্য যুদ্ধে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মুসলিমবাহিনীকে সফল নেতৃত্ব দান করেছেন একইভাবে সাহাবাদেরকে উত্তম নৈতিকতা শিক্ষা দেয়া, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রেও ছিলেন অগ্রণী সেনাপতির ভুমিকায়।

মহানবী (সা.)-এর পর খুলাফায়ে রাশেদীনকেও আমরা সেই নেতৃত্বে দেখতে পাই। মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের সংবাদে যখন সাহাবাগণ পাগলপ্রায় তখন এই বিশৃঙ্খল ও বিক্ষিপ্ত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনেন **হযরত আবু বকর (রা.)**। রসূলে করীম (সা.)-এর ইন্তেকালের পর নেতৃত্বহীন মুসলিম জাতি খেলাফতের মাধ্যমে আবার সেই ঐশী নেতৃত্ব ফিরে পায়। উপস্থিত সকল সাহাবা একমত হয়ে ইসলামের প্রথম খলীফা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বয়াত করেন। চারদিক থেকে ফেতনার উঁচু উঁচু ঢেউ দেখা দিতে লাগল। মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার, মুরতাদ্দীনের ফেতনা ও মুনাফিকদের বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) ঐশী সাহায্যে শক্ত হাতে তা দমন করলেন। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পুনরায় মু'মেনদের মাঝে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করে তাদের ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দিলেন। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা তার পবিত্র গ্রন্থে ঘোষণা দিয়েছেন-

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

অর্থাৎ **তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেরূপে তিনি তাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন এবং নিশ্চয় তিনি তাদের সেই দ্বীনকে সুদৃঢ় করবেন যাকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং নিশ্চয় তিনি তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর তাকে তাদের জন্য শান্তিতে পরিবর্তন করে দিবেন; তারা আমার ইবাদত করবে এবং কোন বস্তুকে আমার সাথে শরীক করবে না; এরপর যারা অস্বীকার করবে তারা দুষ্কৃতি পরায়ণ বলে সাব্যস্ত হবে।** *(সূরা আন নূর: ৫৬)*

**হযরত আবু বকর (রা.)** কুরআন শরীফকে লিখিতভাবে সংরক্ষণ করার মতো গুরুদায়িত্ব ছাড়াও আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন এই খেলাফতের মসনদে বসে যার জন্য আজো মুসলিম জাতি তার নিকট চির কৃতজ্ঞ। হযরত আবু বকর (রা.)-র পর পরবর্তী তিন খলীফাই ইসলামের সেবায় অনন্য অবদান রেখেছেন। মানুষের মাঝে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে শুধু প্রতিষ্ঠিতই করেননি বরং বিশ্বব্যাপি ইসলামের শিক্ষাকে বিস্তার করার মতো গুরুদায়িত্বও পালন করেছেন।

**হযরত উমর (রা.)**-র খেলাফতের নেতৃত্বে পারস্য, রোম, যেরুযালেম, মিসর প্রভৃতির ন্যায় শক্তিশালী সাম্রাজ্য বিজিত হয়েছে। তিনি **'মজলিসে শুরা'** প্রতিষ্ঠিত করে ইসলামের ব্যবস্থাপনাকে আরো শক্তিশালী করেন। হযরত উমর (রা.)-র পর খেলাফতের মসনদে সমাসীন হন হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.)। খলীফা হওয়ার পুর্বেও তিনি ইসলামের সেবায় অনবদ্য অবদান রেখেছেন এবং খলীফা হওয়ার পরেও তিনি মুসলিম উম্মার জন্য ছিলেন **'ঢালস্বরুপ'**। হযরত উমর (রা.)-র যুগে যেভাবে বড় বড় অঞ্চল মুসলমানদের হাতে আসতে থাকে ঐ বিজয়াভিযান হযরত উসমান (রা.)-র যুগেও

অব্যাহত থাকে। আরমেনিয়া, উত্তর আফ্রিকা, তারাবলুস, তিউনিস, মরক্কো, আল জাযায়ের এবং মধ্য এশীয় অঞ্চল, খোরাসান ইত্যাদি মুসলমানদের দখলে আসে। হযরত উসমান (রা.) বড় দক্ষতার সাথে মুসলিম অঞ্চলগুলোর মধ্যে শৃঙ্খলা ও শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। হযরত উসমান (রা.) যখন শাহাদাত বরণ করেন তখন নেতৃত্বহীন মুসলিম জাতি আবার অসহায় হয়ে পড়ে। বিশৃঙ্খল ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আবারো মুসলমানদের মাঝে খেলাফতের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

**হযরত আলী (রা.)** খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হলেন। মুসলমানরা পুনরায় নেতৃত্ব ফিরে পেল। হযরত উসমান (রা.)-র বিরুদ্ধে যারা ফিত্না সৃষ্টি করেছিল (আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবার নেতৃত্বে) তারাই নিজেদেরকে ভালো সাজিয়ে হযরত আলীর খেদমতে আবেদন করেছিল যে, হযরত উসমানকে সরিয়ে আমরা আপনাকে খলীফা বানাতে চাই। হযরত আলী কঠোর ভাষায় তাদের তিরস্কার করেছিলেন এবং বলেছিলেন, **'এই স্থানে যারা আসর জমাবে তাদের উপর আঁ হযরত (সা.) অভিশাপ দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা ফেরত চলে যাও'।**

হযরত উসমান (রা.)-র বিরুদ্ধে ফিত্না দূর করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফতকালে মুনাফেকদের ষড়যন্ত্র ইসলামের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করেছে। হযরত আলী (রা.)-এর আমলে তিনটি গৃহযুদ্ধ ও খারিজিদের উত্থান মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। সকলপ্রকার নৈরাজ্য ও ভীতিপূর্ণ অবস্থাতেও আমীরুল মু'মেনীন হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজ্‌হাহু মুমেনদের জন্য ছিলেন নিরাপত্তার দূর্গ। হযরত আলী (রা.)-র শাহাদাতের সাথেই খেলাফতে রাশেদার পরিসমাপ্তি ঘটে। এটিও ঐশী তকদীর। কেননা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এমনটিই হওয়ার কথা ছিল। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন-

**"আল্লাহ্ তা'লা যতদিন চাইবেন ততদিন তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত থাকবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। তা ততদিন থাকবে যতদিন আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। যার পর ধ্বংসকারী (অর্থাৎ অত্যাচার নিপীরণের) রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং যতদিন আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন তা থাকবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন যার পর অহংকার ও বল প্রয়োগের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং যতদিন আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন তা থাকবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন; অতঃপর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর তিনি (সা.) চুপ হয়ে গেলেন।"** *(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল ও বায়হাকী)*

উপরোক্ত হাদীসে পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। সুরা নুরের আয়াতে ইস্তেখলাফের মধ্যেও এই ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, মু'মেনদের মধ্যে সর্বদা খেলাফত কায়েম থাকবে আর খেলাফতের মাধ্যমে তিনি ইসলামকে সদা সতেজ ও নির্ভেজাল রাখবেন। তবে তার পূর্বে নবুয়্যতের শর্ত রয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে নবুয়ত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তারপর সেই নবুয়তের অনুসরনে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে যেভাবে হাদীসে এসেছে **'খেলাফাতুন আলা মিনহাজিন নবুয়্যত'**। এখন প্রশ্ন হচ্ছে পুনরায় এই খেলাফতের ধারা কার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ্ তা'লা সুরা জুমু'আর ৩-৪ নম্বর আয়াতে শেষ যুগে সাহাবাদের মতই আখারীনদের একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। বেশীরভাগ তফসীরকারক এই বিষয়ে একমত যে এখানে ইমাম মাহ্দীর জামা'তের কথা বলা হয়েছে যারা সাহাবাদের রঙ্গে রঙ্গীন হবে। যদিও যুগের দিক থেকে তারা ভিন্ন কিন্তু আদর্শের দিক থেকে তারা অভিন্ন। তাছাড়া হাদীস শরীফেও আমরা দেখতে পাই রসূলে করীম (সা.) বলেছেন **'ইউশেকু মান আশা মিনকুম আই ইয়ালকা ঈসাবনু মারইয়ামা হাকামান আদলান ইমামান মাহ্দীয়ান'** অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা ঈসা ইবনে মরীয়মকে ন্যায়বিচারক ও মিমাংসাকারী ইমাম মাহদীরুপে আবির্ভূত হতে দেখবে। *(মুসনদ আহমদ)*

মাহদীর যুগে সকল ফিরকার বিলুপ্তি ঘটবে। ইমাম মাহদী (আ.)-এর দ্বারাই ইসলামের অভ্যন্তরীণ সকল মতভেদ দুরীভূত হয়ে এক ইমামের নেতৃত্বে আবার সকল মুসলমান একত্রিত হবে এবং সঙ্গবদ্ধভাবে সমগ্র জগতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটবে। ইসলামী খেলাফত কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে নয় বরং আল্লাহ্ ও রসূলের বর্ণিত পথেই কায়েম হওয়ার কথা। খেলাফত প্রতিষ্ঠার বিকল্প কোন পথ নেই। কুরআন করীম ও হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাস্বরুপ যথাসময়ে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন ঘটেছে। ইমাম মাহ্দীর আগমনের মাধ্যমে মুসলমানরা পূণরায় এশী নেতৃত্ব ফিরে পেয়েছে। নবী করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তিনি মুসলমানদের হারিয়ে যাওয়া ঈমানকে সুরাইয়া থেকে এই ধরিত্রিতে নিয়ে এসেছেন। **আহমদীয়া মুসলিম** জামা'ত সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদীর প্রতিষ্ঠিত জামা'ত। সুতরাং মহানবী (সা.)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী যেখানে শেষ যুগে পূণরায় নবুয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ ছিল তা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে।

**'আহমদীয়া খেলাফত'** কোন নতুন খেলাফত নয় বরং আমরা বলতে পারি এই খেলাফত রসূলে করীম (সা.)-এর পর প্রতিষ্ঠিত হওয়া **খেলাফতে রাশেদারই** ধারাবাহিকতা। রসূলে

করীম (সা.)-এর ওফাতের পর আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে মুমিনদের অস্থিতিশীল অবস্থাকে নিরপত্তায় বদলে দিয়েছিলেন ঠিক তেমনি আহমদীয়া খেলাফতের মাধ্যমেও আল্লাহ্ তা'লা মুমেনদের জামা'তকে একটি নিরাপত্তা বলয়ে আশ্রয় দিয়েছেন।

খেলাফত প্রতিষ্ঠা কোন মামুলি বিষয় নয়। খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক মিছিল মিটিং আন্দোলন হয়েছে কিন্তু সেই খেলাফত যা মুমেনদের জন্য আশ্রয়স্থল তা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। অনেক রাজত্ব ও রাষ্ট্র খেলাফত নাম দিয়ে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু তাদের কর্মকান্ডই প্রমাণ করে দিয়েছে যে তা কোন আধ্যাত্মিক খেলাফত ছিল না বরং পুরোপুরি জাগতিক স্বার্থ হাসিল করার উদ্দেশ্যেই এমন রাজত্বের নাম খেলাফত দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। অপরদিকে আহমদীয়া খেলাফতের সূচনা ও কর্মকান্ডের দিকে অভিনিবেশ করলেই এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটি সম্পূর্ণরুপে ঐশী সাহায্য ও সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত খেলাফত। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর অনুবর্তিতায় প্রতিষ্ঠিত এই ঐশী খেলাফত কিয়ামত পর্যন্ত বহমান থাকবে ইনশাআল্লাহ্। কেননা নবী করীম (সা.) শেষ যুগে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর পর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন কিন্তু এর সিলসিলাহ্ শেষ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি (সা.) কিছু বলেননি। হাদীসে এসেছে নবী করীম (সা.) বলেছেন-

ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةٌ عَلٰى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ

(مسند احمد۔ بیہقی۔ مشکوٰۃ)

অর্থাৎ **"তিনি (সা.) বলেছেন শেষ যামানায় নবুয়্যতের পদ্ধতিতে পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এরপর তিনি (সা.) চুপ হয়ে গেলেন।"** সুতরাং বুঝা গেল ইমাম মাহদী (আ.)-এর ওফাতের পর যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে তা কিয়ামত পর্যন্ত বহমান থাকবে যতদিন এই জামা'তের লোকদের মাঝে ঈমান ও নেক আমল বিদ্যমান থাকবে যেভাবে আয়াতে ইস্তেখলাফে খেলাফত প্রতিষ্ঠার শর্ত বর্ণিত হয়েছে।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর লিখিত পুস্তকে খেলাফত প্রতিষ্ঠার সংবাদ দিয়ে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। এই খেলাফতকে তিনি দ্বিতীয় কুদরত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যা তার মৃত্যুর পর আসবে। তিনি (আ.) বলেন- **"হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল হতে আল্লাহ্ তা'লার এই বিধান রয়েছে যে, তিনি দুটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দুটি মিথ্যা উল্লাস ব্যর্থ করে দেখান, এমতাবস্থায় এখন সম্ভবপর হতে পারে না যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা চিন্তিত হবে না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়, কারণ তোমাদের পক্ষে দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন, এবং এর আগমন তোমাদের পক্ষে শ্রেয় কারণ তা স্থায়ী, তার ধারাবাহিক শৃঙ্খল কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না।"** [(আল ওসীয়্যত, পুস্তক-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)]

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওফাতের পর ১৯০৮ সালের ২৭ মে সেই দ্বিতীয় কুদরত অর্থাৎ খেলাফতে আহমদীয়ার যাত্রা শুরু হয়। যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুতে মু'মেনদের জামা'ত যখন শোকে মুহ্যমান ও চারিদিকে বিরোধীদের আনন্দ উল্লাস এই ভেবে যে **'এই জামা'ত এখানেই শেষ'** ঠিক তখনি আল্লাহ্ খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করে বিরোধীদের সেই মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থ প্রতিয়মান করেন এবং মু'মেনদের জামা'তের বিশৃঙ্খল অবস্থাকে সুশৃঙ্খল করে নিরাপত্তার চাদরে আশ্রয় দান করেন।

জামা'তে আহমদীয়া বিশ্বকে কেবল সত্যিকারের ইসলাম সম্বন্ধেই অবহিত করেনি বরং ইসলামের হারিয়ে যাওয়া নেতৃত্বকে পূণরায় ধরাপৃষ্ঠে ফিরিয়ে এনেছে। এই নেতৃত্বকেই ইসলামের পরিভাষায় **'খেলাফত'** বলা হয়। এটি সেই কল্যাণময় সংগঠন যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের সাথে করেছেন। প্রাথমিক যুগে আল্লাহ্ তা'লা এ পুরস্কার খেলাফতে রাশেদার আকারে দিয়েছিলেন। এটা পরে রাজত্বে পরিণত হয় এবং এক পর্যায়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমানরা লাঞ্ছনা ও পরাজয়ের শিকার হয়। ইসলামের জীবিত হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লা **হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)**-কে আবির্ভূত করেন। ইসলামের নবজাগরণ সুচিত হয়। জামা'তে আহমদীয়ার মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা **দ্বিতীয় কুদরত 'খেলাফত'** প্রতিষ্ঠিত করেন। যারা খোদার এ পুরস্কার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারা গোমরাহী ও অন্ধকারে নিপতিত হয়েছে। আজও বঞ্চনা ও বিফলতা তাদের ভাগ্যের লিখনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যারা খেলাফতের জ্যোতিতে নিজেদের হৃদয় আলোকিত করেছে তারা সেই খেলাফতরূপ প্রদীপের উপর পতঙ্গের ন্যায় বিলীন হয়েছে এবং যুগখলীফার প্রত্যেক ডাকে **'লাব্বায়েক' 'লাব্বায়েক'** বলে নিজেদের প্রাণ, সম্পদ এবং মান-সম্ভ্রমের কুরবানি পেশ করাকে নিজেদের সৌভাগ্য বলে মনে করেছে।

নেযামে খেলাফতের কল্যাণে পুণ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে জামা'তে আহমদীয়াকে উন্নতি ও দৃঢ়তা দেয়া হয়েছে। ভয়ের সব অবস্থা নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেয়া হয়েছে

এবং হচ্ছে। আজ সারা বিশ্বে এ একটি জামা'তই খেলাফতের কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত।

খোলাফায়ে রাশেদীনের পদ্ধতিতে সঠিক ইসলামী খেলাফত ধরাপৃষ্ঠে বর্তমানে কেবল জামা'তে আহমদীয়ার মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। **রয়েছে কেন্দ্র, রয়েছে বায়তুল মাল আর রয়েছে মজলিসে শূরা।** দ্বিতীয় কুদরতের নিদর্শন খেলাফতের মাধ্যমে আজ ইসলাম অপ্রতিহত গতিতে **এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং দ্বীপ ও উপদ্বীপসমূহে** বিস্তার লাভ করছে। খেলাফতের নেতৃত্বে বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, শত শত মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে, স্কুল-কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং এই খেলাফতের বরকতে আল্লাহ্ তা'লা কবুলিয়তে দোয়ার অজস্র নিদর্শন প্রকাশ করছেন। যুগ-খলীফার বিভিন্ন বরকতপূর্ণ তাহ্রীকে আহমদী মুসলমানরা কায়মনোবাক্যে লাব্বায়েক বলে সাড়া দিয়ে চলেছে। ইসলামসেবার নিত্য নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। বিভিন্ন ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে বিশ্ববাসির কাছে। আর্ত মানবতার সেবায় দিন-রাত্রি কাজ করে যাচ্ছে **'হিউম্যানিটি ফার্স্ট'**। **মুসলিম টিভি আহমদীয়া (এম, টি, এ)**-এর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর আনিত প্রকৃত ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষা দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হচ্ছে যার কল্যাণে আজ লাখো প্রাণ ইসলাম গ্রহণ করতে পারছে। অনুন্নত দেশসমূহ যেমন আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে অসংখ্য **স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল**। জীবন উৎসর্গীকৃত **আহমদী মুবাল্লেগগণ** পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অনেক কঠিন পরিস্থিতিতেও নিঃস্বার্থভাবে ইসলাম প্রচারের কাজ করে যাচ্ছে। আর এ সবই হচ্ছে একক নেতৃত্বের অধীনে। এক নেতার নির্দেশনা ছাড়া এত বড় বড় কাজ সম্পাদন কখনোই সম্ভব নয়। আমরা যারা আহমদী আমাদের আল্লাহ্ তা'লার কাছে অনেক বেশী শুকরিয়া আদায় করা উচিত যে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে খেলাফতের এই নেয়ামত দান করেছেন। আমরা কত সৌভাগ্যবান যে খলীফার ছায়া আমাদের মাথার উপর রয়েছে। সকল বিপদাপদে খলীফা আমাদের জন্য **'ঢালস্বরুপ'**। আমরা ঘুমিয়ে থাকি কিন্তু খলীফা আমাদের জন্য রাতের ইবাদতে জেগে থাকেন। খলীফা আমাদের জন্য নিরাপদ দূর্গ আমাদের **'রক্ষাকবচ'**। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে সর্বদা খেলাফতের নিরাপত্তার চাদরে আবৃত রাখুন। (আমীন)

# চিরন্তন সত্য

**মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম**
ছাত্র: ৪র্থ বর্ষ, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

বিশ্বের মাঝে কেনো এত কদাচার,
শান্তির নীড়ে নাই কেহ, অশান্তি নিরাকার।
সত্য ডুবিছে আঁধারে, মিথ্যা আলোকিত হায়,
পৃথিবীটাই তো নিমজ্জিত আজ অরাজকতায়।
মুসলিম দেখো নামাযে দাঁড়ায়ে ফের পিছু চায়,
এই বুঝি চপল জোড়া চোরে নিয়ে যায়।
তাই সম্মুখপানে যতন করে রেখেছে তাহারে,
প্রভূকে নয় সেজদা করে সে জুতারে।
জগৎবাসীই নিয়েছে যখন সবার দায়ভার,
আল্লাহ্‌র ঘরে তখন জয় হয় মিথ্যার।
এ কেমন বিচার আজ এই বসুধায়?
সত্যের তেজ কমেছে, সে আঁধারে লুকায়।
খুন-রাহাজানি আজ পেশা হয়েছে সবার,
ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ মিটবেনা কি কভু আর?
শুনবো আর কতো আর্তনাদ, আর কতো চিৎকার?
ত্রাসের এই রাজ্যে শুধু হতাশা আর হাহাকার।
একদিন ঠিকই প্রেম-প্রিতি সৌহার্দের হবে উদয়,
শান্তির বার্তায় পৃথিবীটা হয়ে যাবে সুখময়।
পৃথিবীর কোণে কোণে দাড়া হবে ইসলাম,
মুখে মুখে মুখরিত হবে সত্যের জয়গান।
মিথ্যাবাদী মোল্লার দল পড়বে তখন ফাঁদে,
ফতোয়াবাজীর অন্তরালে লোক দেখিয়ে চাঁদে।
তবুও ক্ষান্ত হবে না তারা ফতোয়াবাজীর জোড়ে,
সত্যের পরাজয়ে তারা লেগেছে উঠেপরে।
কিন্তু হায় খোদার মর্জি কে রুখতে পারে?
মনুষ্যকূল ধীরে ধীরে লুফে নিবে সত্যেরে।
এসে গেছে সেই যুগ দেখো নয়ন খুলে,
মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্য মুখ ফুটে কথা বলে।
বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে সত্য হয়েছে খাঁড়া,
সত্যের পিছু ছুটছে মানুষ মিথ্যেকে করে তাড়া।
হে ধর্মান্ধরা! একবার দেখো চর্মচক্ষু খুলিয়া,
উপলব্ধি করো একবার অন্তর্চক্ষু দিয়া।
দেখিবে সত্যের নদী খুবই প্রসারিত,
মিথ্যা মরিচীকায় বিবর্ণ, অবহেলিত।

# ঐশী খলীফা এবং রাষ্ট্রনায়ক– দু'টি এক কথা নয়

মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

'খিলাফত' সংক্রান্ত আলোচনায় দু'টি জিজ্ঞাসা অত্যন্ত গুরুত্বের দাবীদার। **প্রথমতঃ** খেলাফত কি একটি আধ্যাত্মিক পদ নাকি জাগতিক অথবা রাজনৈতিক একটি ক্ষমতা বিশেষ? **দ্বিতীয়তঃ** খেলাফত এবং রাষ্ট্র দু'টি বিষয় কি একে অপরের পরিপূরক? খলীফা সম্পর্কে কুরআন, সুন্নতসম্মত প্রজ্ঞাপূর্ণ দিক-নির্দেশনা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় গোটা মুসলিম বিশ্ব নানা দলে উপদলে ভাগ হয় যার ফলে ইসলাম বিদ্বেষীরা এই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গকে খাটো করার হীন উদ্দেশ্যে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তাদের মতে, সূচনা থেকেই খেলাফত কোন আধ্যাত্মিক পদ ছিল না। এসম্পর্কে তাদের প্রমাণ হিসেবে একটি উদ্ধৃতি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাদের মতে– **"মুহাম্মদ (সা.) একজন নবী হওয়ার পাশাপাশি একাধারে সেনাপতি, বিচারপতি এবং রাষ্ট্রনায়ক; অর্থাৎ মুহাম্মদ-ই (সা.) সর্বেসের্বা। নবুয়ত তাঁর (সা.) মাধ্যমে সমাপ্ত; তাই মহানবী (সা.)-এর প্রতিনিধিত্ব বা স্থলাভিষিক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। এককথায়, চার খলীফা ছিলেন মূলতঃ মুহাম্মদ (সা.)-এর অবর্তমানে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি। এরপর আবু বকর (রা.) খলীফা হওয়ার পর নবুওতের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছাড়া যাবতীয় রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্ব পালন করেন; কেননা নবুওতের কাজ মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে।"** *(তথ্যসূত্র : Philip K Hitti রচিত History of Arabs গ্রন্থ; পৃষ্ঠা: ১৩৯ ও ১৭৮, ১০ম সংস্করণ)*

অর্থাৎ খেলাফতকে এতটাই মামূলী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে নিতান্ত সাধারণ একজন মুসলমান ব্যক্তির দ্বারাও এই কাজ সম্ভব। আর অন্যদিকে খলীফাকে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে পরিচয় করানো হয়। তদ্রুপ আর্নল্ডের ভাষায়– **Succession to Muhammad (Khilafah) meant succession to the sovereignty of the state.** *(তথ্যসূত্র: Philip K Hitti রচিত History of Arabs গ্রন্থ; পৃষ্ঠা: ১৮৫, ১০ম সংস্করণ)*

অর্থাৎ তার বক্তব্যের সারকথা– মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিনিধি তথা খেলাফতের উদ্দেশ্য কেবল রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করা; কেননা কারো পক্ষে মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়তের স্থলাভিষিক্ত হওয়া সম্ভব নয়। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের লেখক Bernard Lewis স্বরচিত **The Political Language of Islam** গ্রন্থে খেলাফতকে a divine right of monarchy তথা ঐশী রাজত্ব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিড লাইন অলব্রাইট Madeleine Albright স্বরচিত **The Mighty and The Almighty** গ্রন্থে আল কায়েদা'র সহিংস কার্যকলাপের কারণ হিসেবে খেলাফত প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেন। আর খেলাফতকে গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য এক ও অভিন্ন ধর্মীয় রাষ্ট্রের প্রতিশব্দ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। আমাদের কোন ক্ষতি হতো না যদি বিষয়টি এতটুকু-ই থাকত। বিপত্তি তো তখনই বাঁধে যখন অধুনা মুসলমান রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় রাঘব বোয়ালরাও খেলাফতকে রাজনীতির সাথে গুলিয়ে ফেলে। বেনজীর ভুট্টো তাঁর স্বরচিত **Reconciliation– Islam Democracy and The West** পুস্তকে বলেন, সেনাশাসিত পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের আঁখড়া হয়ে গিয়েছে যার প্রথম উদ্দেশ্য হলো সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে একক রাষ্ট্রে পরিণত করে খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

অন্য সবার কথা বাদ দিলেও **সৈয়্যদ আবুল আলা মৌদুদী'র** বক্তব্য নিশ্চয় জ্ঞানীগুণীজনের মনে আছে! ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের রূপরেখাকে তিনি যেভাবে অঙ্কন করেন তা আসলে ইসলামের জন্য মরার উপর খাড়ার ঘা প্রতিপন্ন হয়। তার মতে– **'পৃথিবীতে ইসলাম নাকি মুহাম্মদ (সা.)-এর দীর্ঘ তের বছরের বাগ্মীতাপূর্ণ তেজস্বী ভাষায় উপদেশবাণীর ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় নি; বরং (তার ভাষ্যমতে) তিনি (সা.) তরবারি ধারণ করলেন আর নিমিষেই মানুষের হৃদয়ের কপাট খুলে গেল। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।'** *(তথ্যসূত্র: মৌদুদি রচিত পুস্তক 'আল জিহাদ ফিল ইসলাম', পৃষ্ঠা: ১৩৮)*

এ যেন ঘরের শত্রু বিভীষণ। কাজেই এমন বন্ধু থাকলে আর বোধ করি বহিঃশত্রুর প্রয়োজন নেই। তাই তো প্রবাদে যথার্থই বলা হয়েছে, **'যে সরিষা দিয়ে ভূত তাড়াবো, সেই সরিষাতেই ভূতের বাস।'**

সারকথা হলো, এভাবে ক্রমেই একটি ধারণা সর্বসাধারণের মজ্জাগত হয়ে যায়। তাদের দৃষ্টিতে বর্তমানে প্রচলিত ঘুঁনেধরা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গেচুরে ঢেলে সাজাতে হবে; কেননা এর আদ্যোপান্ত জাহেলিয়াত। যত্তসব নাজায়েয কীর্তিকলাপ। অতএব জাহেলিয়াতকে এই ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলাই ইসলামের গুরুদায়িত্ব। কাজেই পরিণতি যা হবার তাই হলো। মিশরের **ইখওয়ানুল মুসলিমীন**, পাকিস্তানের **জামা'তে ইসলামী** আর আফাগানিস্তানের **তালেবান**-এর মত সঙ্গঠনগুলোর মূলমন্ত্র এই বদ্ধমূল ধারণাই যাকে মুসলিম বিশ্বের এই বিষফোঁড়ার বীজ বললে অতিরঞ্জন হবে না। এটি যে ইসলামের জন্য ক্যান্সার সেটি বুঝতে আজ আর কারো বেগ পেতে হয় না।

অথচ খলীফা নবীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ভবিষ্যতে অব্যাহত রাখার জন্য কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করেন। সুতরাং সহজ কথায় খলীফার কাজ তা-ই যা নবীর কাজ। মহানবী (সা.) নিজেকে সূরা বাকারার ১৩০ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দোয়ায় উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এই দোয়ার ফলশ্রুতিতেই মহানবী (সা.) নিজের আগমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে সূরা জুমু'আকে সত্য যাচাইয়ের কষ্টিপাথর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই আয়াতের প্রতিপাদ্য হলো– **নবী-রসূলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চারটি। প্রথমতঃ** يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার আয়াত তিলাওয়াত, **দ্বিতীয়তঃ** وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ তথা কিতাব শিক্ষাদান, **তৃতীয়তঃ** وَالْحِكْمَةَ অর্থাৎ প্রজ্ঞা শিক্ষাদান **চতুর্থতঃ** وَيُزَكِّيْهِمْ তথা তাদেরকে পবিত্রকরণ। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত নবী-রসূলের কর্ম-পরিকল্পনাকে নবীর পরে অক্ষুন্ন রাখাই একজন খলীফার কাজ। সুতরাং খলীফা কোনক্রমেই পার্থিব কোন পদবীর নাম হতে পারে না। অন্যথায় খেলাফত প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়ে **খেলাফত আন্দোলন, খেলাফত মজলিস** প্রভৃতি তো আর কম হলো না!

কোন কোন দল আবার আল্লাহ্র রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বিলুপ্তপ্রায় ইসলামকে হেফাযতের গুরুদায়িত্ব নিয়েছে। সুতরাং নকলের ভিড়ে আসল ইসলামকে খুঁজে বের করাই যেন বিরাট ব্যাপার। পাকা জহুরী অর্থাৎ আল্লাহ্র খলীফা ছাড়া যাবতীয় মানবীয় চেষ্টা ব্যর্থ। কাজেই ধ্বজাধারী জ্ঞানপাপীরা ব্যক্তিগত মতামত, বিশ্বাস তাদের ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যেতেই পারে। এতে কারো কিছু-ই যায় আসে না; তবে মস্তবড় ক্ষতিটি হয় ইসলাম নামক নিষ্কলঙ্ক, পুতঃপবিত্র সৌধটির।

তবে একথাও সত্য যে, অল্প সংখ্যক নবী-রসূল শাসক ছিলেন; সিংহভাগ নন। **হযরত মূসা (আ.)** ফেরাউনের তুমুল বিরোধীতার মুখে হিজরত করতে বাধ্য হন। **হযরত ঈসা (আ.)**-কে তো রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার বাসনার অপবাদ দিয়ে ক্রুশেই দেয়া হয়। নবীকূল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) মদীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত হয়েছেন নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিগৃহীত তবুও দয়াল নবী সহনশীলতার অনুপম শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তখন কিন্তু জাগতিক কোন ক্ষমতা ছিল না। তবে কি তিনি তখন নবী ছিলেন না? জীবনে তিনি রাষ্ট্রনায়ক হয়েছেন বটে কিন্তু ইতোপূর্বে প্রজা বা সাধারণ নাগরিক হয়েও একজন নবী ছিলেন। হিজরতের প্রাক্কালে **'বয়আতে আকাবা'**-র শপথকালে সেখানে কোন রাষ্ট্রক্ষমতার কথা বলা হয় নি। সেদিন মদীনাবাসীর একটি প্রশ্ন প্রণিধানযোগ্য। তারা জিজ্ঞেস করে, বিনিময়ে আমরা কী পাব? জবাবে বলা হয়, কেবল জান্নাত। অর্থাৎ জাগতিক কোন কিছুর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় নি। কেন দেয়া হয় নি? কারণ রাষ্ট্রক্ষমতা নবুয়তের অংশও নয় এবং উদ্দেশ্যও নয়। পূর্বল্লিখিত নবুয়তের ৪টি লক্ষ্য অর্জিত হলেই রাষ্ট্রক্ষমতা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আয়ত্তাধীন হয়ে যায়, কিন্তু **খেলাফত ও রাষ্ট্রক্ষমতা** দু'টি পৃথক বিভাগ।

খেলাফতের আভিধানিক অর্থে যদিও জাগতিক ক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত তবে এটি যখনই নবীর প্রতিনিধিত্বের জন্য ব্যবহৃত হয় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রনায়ক বা শাসক হওয়া আবশ্যক নয়। পবিত্র কুরআন প্রদত্ত শিক্ষা ও নবী-রসূলদের বর্ণাঢ্য জীবন এর জলজ্যন্ত সাক্ষী। মুসলিম জাতিকে সৎকর্মশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার শর্তে খেলাফতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এক সুদীর্ঘকালব্যাপী পূর্ববর্তী জাতিসমূহের খেলাফতের সাথে রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল না। খেলাফতে রাশেদার পরে তা সাম্রাজ্যে বদলে যাওয়ায় এ বিষয়ে ধ্যান-ধারণাও বদলে গেল। সুতরাং খলীফা যুগ্মভাবে রাষ্ট্রনায়ক ও রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন আবার জাগতিক কোন পদ-পদবী বিহীন শুধুমাত্র খলীফাও হতে পারেন। শিয়া সম্প্রদায়ের ষষ্ঠ ইমাম জাফর সাদেক খেলাফতকে স্বাধীন, স্বতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠানের স্বপক্ষে বর্ণনা করেন, **"মুসলমানরা অভিন্ন জাতিসত্তা হয়েও ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র বা রাজত্বের অধীনস্থ হতে পারে।"** বিষয়টি হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে আবু বাসীর সংক্রান্ত একটি ঘটনার মাধ্যমেও প্রতীয়মান হয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধির চতুর্থ শর্তটি ছিল– **'কুরাইশদের কেউ মদীনায় আশ্রয় নিলে তাকে ফেরত দিতে হবে। কিন্তু মদীনার কোন মুসলমান মক্কায় আশ্রয় নিলে তাকে ফেরত দেয়া হবে না।'** ঠিক এমন সময় মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের খবর

শুনে সুহাইল ইবন আমরের পুত্র **আবু জানদাল** শৃঙ্খলিত অবস্থায় পালিয়ে এলো। ওদিকে দেখামাত্র পিতা সুহাইল ইবন আমর তার মুখে সপাটে চপেটাঘাত করে এবং তার পরনের বুকের কাপড় টেনে ধরে। আবু জানদাল মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে তার প্রাণভিক্ষার আকুতি জানান। সুহাইল বলে, **"দেখ মুহাম্মদ! আগেই চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।"** মহানবী (সা.) বলেন, **"কথা সত্য।"** অতঃপর আবু জানদালের সেই করুণ আর্তনাদে আরবের আকাশ বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। চিৎকার করে আবু জানদাল বলছিল, **"হে মুসলমানগণ! আমাকে আজ ইসলাম গ্রহণের অপরাধে যারা নির্যাতন করছে সেই কুরাইশদের কাছেই আমাকে ফেরত পাঠানো হবে?"** মহানবী (সা.) বললেন,

**يا أبا جندل! قد تم الصلح بيننا و بين القوم، فاصبر حتى يجعل الله لك فرجا و مخرجاً**

**"হে আবু জানদাল! আমাদের মাঝে চুক্তি হয়ে গেছে। ধৈর্য ধারণ কর; আল্লাহ্ নিশ্চই কোন উপায় বের করবেন।"**

চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার কয়েক দিন পরের কথা। আবু বাসীর নামে এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে মক্কা থেকে মদীনায় পালিয়ে আসে। মক্কার কুরাইশরা তার পিছু নেয়। এরপর মহানবী (সা.)-এর কাছে শান্তিচুক্তির শর্তানুযায়ী আবু বাসীরকে ফেরত চায়। সেও আবু জানদালের মত আকুতি জানায়। ন্যায়ের মূর্তপ্রতীক মহানবী (সা.) তাকে ফিরে যেতে বলেন। মক্কাবাসীরা তাকে ফেরত নিয়ে যাবার সময় আবু বাসীর তাদের সর্দারকে হত্যা করে পালিয়ে লোহিত সাগরের উপকূলে পৃথক বসতি গড়ে তুলে। ক'দিন বাদে আবু জানদালাও সেখানে এসে যোগ দেয়। এভাবে এই শরণার্থীদের সংখ্যা বিভিন্ন বর্ণনানুযায়ী ৩০০ জন হয়।

লক্ষ্য করুন! আবু বাসীর এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রনায়ক মহানবী (সা.) মদীনা রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত করেন নি। সুতরাং ঘটনাটি থেকে প্রতিপাদ্য বিষয় হলো– শান্তি চুক্তির শর্তানুযায়ী ভিন্ন অঞ্চলের মুসলমান এক ও অভিন্ন ধর্মচর্চা করেও এক ইমামের অধীনে সহাবস্থান করতে পারে।

ইসলাম একটি জীবনমুখী, বাস্তবমুখী বিধানের নাম এবং অস্ত্রের ঝনঝনানির মাধ্যমে নয় বরং **Survival of the fittest**-এই নীতি অনুযায়ী একটি ভারসাম্যপূর্ণ সার্বজনীন ধর্ম। একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করাই এর চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যার ফলশ্রুতিতে নিঃসন্দেহে রাজত্ব বা রাষ্ট্রক্ষমতাও করায়ত্ত হতে পারে কিন্তু নবুয়ত ও খেলাফতের কাজ তাই যা সূরা জুমু'আতে বর্ণিত হয়েছে।

খেলাফতে আহমদীয়া এই অর্থেই প্রতিনিধিত্ব বা স্থলাভিষিক্ত হওয়া। এজন্য রাজত্ব লাভ তথা রাষ্ট্রক্ষমতাকে খেলাফতের সাথে গুলিয়ে ফেলার ধারণা আধ্যাত্মিকতাশূণ্য, প্রজ্ঞাশূণ্য আর অনুর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত মানসিকতার ফসল। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর কালজয়ী একটি দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে বিষয়টির ইতি টানছি।

তিনি (রা.) বলেন, **"হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)- কে আল্লাহ্ তা'লা কেবলমাত্র ঐশী খেলাফত দিয়েছেন। কাজেইভবিষ্যতেও রাষ্ট্রনায়করা যখন এই জামা'তভুক্ত হবেন তখনও খেলাফত রাজনৈতিক বলয় ও প্রভাবমুক্ত থাকবে। এটি লীগ অব নেশন্স-এর মূল ভূমিকা পালন করবে এবং আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি অটুট ও মজবুত করার পাশাপাশি ধর্মীয় মূল্যবোধ, শিক্ষা-দীক্ষা এবং আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে তৎপর ও আন্তরিক থাকবে। অতএব অতীতের মত ঐশী খলীফার সাথে রাষ্ট্রনায়ক বা সেনানায়কের ভূমিকাকে গুলিয়ে ফেলবেন না।"** *(তথ্যসূত্র: বারাকাতে খেলাফত, আনোয়ারুল উলুম ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৯) [এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেব রচিত পুস্তক 'খেলাফতে আহমদীয়া' অবলম্বনে]*

# আহমদীয়া খেলাফতই প্রতিশ্রুত ঐশী খেলাফত

মাওলানা জহির উদ্দীন আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۵۶﴾

এ আয়াতের অনুবাদ হচ্ছে, **"তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে (এবং) আমার সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে না। আর এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে তারাই দুষ্কৃতিকারী।"** *(সূরা আন নূর: ৫৬)*

এই আয়াতের বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্ট যে, মুসলমানদের সাথে আল্লাহ্ তা'লার এ প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, ইসলামে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। একই সাথে আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতে আরো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, **'আমি তোমাদের দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবো এবং তোমাদের ভয়ভীতির অবসান ঘটিয়ে তোমাদের মাঝে শান্তি ফিরিয়ে দিব'**। তবে হ্যাঁ! রসূল করীম (সা.)-এর একটি উক্তি অনুসারে মুসলমানদের কর্ম এবং ঈমান নষ্ট হয়ে যাবার কারণে এক সময়সীমার পর মুসলমানদের মধ্য থেকে এই নেয়ামত উঠিয়ে নেয়া হবে। কিন্তু একই সাথে বলা হয়েছে, দৃঢ় ঈমানের অধিকারী ও সৎকর্মশীল এবং খোদার শেষ ও পরিপূর্ণ ধর্মের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাদের মাঝে এই ব্যবস্থাপনা আবার প্রতিষ্ঠিত হবে। **'খেলাফাতুন আলা মিনহাজিন্ নবুয়্যত'** অর্থাৎ নবুয়্যতের পদ্ধতিতে আবার খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।

এখন প্রশ্ন হল, পুনরায় এ খেলাফত কখন প্রতিষ্ঠিত হবে? ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, খোলাফায়ে রাশেদার যুগ ছিল ইসলামের স্বর্ণযুগ। এরপর উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের সময় ইসলামী খেলাফত রাজতন্ত্রে রুপ নেয়। পরে তা হালাকু খাঁ কর্তৃক ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে দেশভিত্তিক রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। তখন ইসলামী খেলাফত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং উনবিংশ শতাব্দীতে তা তুরস্কে নিভু নিভু অবস্থায় টিকে থাকে। পরে কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক তা-ও নির্বাপিত হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলামে পুনরায় নবুয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠা হবার কথা। কুরআন ও হাদীসের দলিল-প্রমাণ থেকে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এবং তাঁর তিরোধানের পর পুনরায় নবুয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার কথা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"আমার শতাব্দী উত্তম, এরপর তৎসন্নিহিতগণ, এরপর তৎসন্নিহিতগণ, এরপর মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হবে।"** *(নিসাঈ, মিশকাত)*

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

অর্থাৎ **"তিনি (আল্লাহ্) আকাশ হতে পৃথিবীতে (কুরআনী শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য) ব্যবস্থা পরিচালনা করেন, এরপর তা তাঁর দিকে উঠে যাবে একদিনে, যা তোমাদের গণনায় এক হাজার বৎসর।"** *(সূরা আস্ সিজদাহ্, আয়াত: ৬)*

উপরের হাদীস ও কুরআনের উদ্ধৃতি দুটি থেকে জানা যায় মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পরবর্তী তিন'শ বছর মুসলমানদের উন্নতির যুগ এবং তৎপরবর্তী এক হাজার বছর অবনতির যুগ, অর্থাৎ হুযুর পাক (সা.)-এর মৃত্যুর তের'শ বছরের ভিতর মুসলমানদের চরম অবনতি ঘটবে। এ সময়ই হাদীসের ভাষায় ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে উঠে যাবে বলে বর্ণিত আছে।

তখনই ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হবেন। অর্থাৎ হিজরী তেরশ বছর পর অর্থাৎ চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীই তাঁর আগমনের নির্দিষ্ট সময়। সে অনুযায়ী যথাসময়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী রুপে আবির্ভূত করেছেন। তিনি (আ.) ১৩০৬ হিজরী সনে বা চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর শিরোভাগে নিজেকে ইমাম মাহদী হিসেবে দাবী করেন। তাঁর এ দাবীর পর থেকে আজ পর্যন্ত অন্য কোন দাবীকারক না থাকাও তাঁর সত্যতার প্রমাণ বহন করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি ছিল যে, তাঁর তিরোধানের পর দ্বিতীয় কুদরত অর্থাৎ খেলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মিশনকে পূর্ণতা দিবেন। ইসলামকে তিনি পুনরায় জয়যুক্ত করবেন। মান্যকারীদের প্রশান্তির ব্যবস্থা করবেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল ওসীয়্যত পুস্তিকায় এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়া এবং খেলাফতের মাধ্যমে জামা'তের উন্নতি এবং অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকা সম্পর্কে বলেন যে, **"হে আমার প্রিয়গণ! যেখানে আদি থেকে আল্লাহ্ তা'লার রীতি এটিই চলে আসছে যে, আল্লাহ্ তা'লা দু'টি কুদরত প্রদর্শন করেন যেন বিরোধীদের দু'টি মিথ্যা উল্লাস কে পদপিষ্ট করে দেখাতে পারেন। তাই এখন সম্ভব নয় যে, খোদা তা'লা তাঁর আদি রীতি পরিত্যাগ করবেন। তাই এখন আমি আমার সেই কথা যা তোমাদের সামনে বর্ণনা করেছি, তা শুনে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ো না। তোমাদের হৃদয় যেন চিন্তা কবলিত না হয়।.... তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও আবশ্যক। এর আগমণ তোমাদের জন্য কল্যাণকর, কেননা তা চিরস্থায়ী। এর ধারা কিয়ামত পর্যন্ত কর্তিত হতে পারে না আর সেই দ্বিতীয় কুদরত তথা খেলাফত ততক্ষণ আসতে পারে না যতক্ষণ আমি না যাব। কিন্তু আমি যখন যাব আল্লাহ্ তা'লা তখন সেই দ্বিতীয় কুদরত তোমাদের জন্য প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে।"** *(পুস্তক: আল-ওসিয়্যত)*

জামা'তে আহমদীয়ার ইতিহাস দেখুন, খোদার এটি অনেক বড় করুণা ও অনুগ্রহ যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর জামা'ত দোদুল্যমান ও প্রকম্পিত হয় ঠিক যেমনটি হয়েছিল মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর। কিন্ত আল্লাহ্ তা'লা **'সুম্মা তাকুনু খেলাফাতুন আলা মিনহাজিন নবুয়্যহ্'** অনুযায়ী হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মাধ্যমে জামা'ত কে তাৎক্ষণিকভাবে পূর্বের অবস্থায় বহাল করেন। তাঁর খেলাফতের সময়কার অবস্থাও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সময়কার মতো ছিল। কিন্তু খোদা তা'লা মুমিনদের হৃদয়কে একত্রিত করলেন এবং ভয়ভীতির পর শান্তি ও নিরাপদ অবস্থা আনয়ন করলেন। যাদের মাথায় দুষ্কৃতি ছিল তারা শীঘ্র ধরা পরলো। তাঁর যুগে খেলাফতের কল্যাণে ইসলাম দূরপ্রাচ্যে ইউরোপ ও আমেরিকার বুকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বব্যাপি ইসলাম প্রচারের এক নব দিগন্তের সূচনা হয়।

**খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের** ইন্তেকালের পর জামা'ত পুনরায় প্রকম্পিত ও দোদুল্যমান হয়। **খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)** খেলাফতের মসনদে বসার পর ভেতর-বাহির উভয় দিক থেকে বিরোধীতার ঝড় উঠে। ষড়যন্ত্রের জাল বুনা হয় এবং তাঁর উপর উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় বিপদাবলী আছড়ে পড়ে। তিনি (রা.) একজন অল্প বয়সী যুবক ছিলেন, যার ঝোলায় জাগতিক বা ধর্মীয় শিক্ষার বড় কোন ডিগ্রী ছিল না, কোন টাইটেলও ছিল না। পক্ষান্তরে **মৌলভী মোহাম্মদ আলী ও খাজা কামালুদ্দীনের** মত বি. এ, এম. এ ডিগ্রীধারী সাহাবারা জামা'তের মধ্যে থেকে তাঁর বিরোধিতায় লিপ্ত হন। এসব বিরোধীদের সবাই সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং সমাজে নামকরা ব্যক্তি ছিলেন। তারা জামা'তকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন, জামা'তের কোষাগার থেকে সমস্ত অর্থ নিয়ে যান। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন এবং জামা'তের উন্নতির গতি রোধ করতে সব ধরনের চেষ্টা করেন। অপরদিকে আহমদীয়াতের বিরোধীদের মধ্যে **আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারী ও মৌলভী আবুল আলা মৌদুদীর** মত লোকেরা জামা'তের বিরোধীতায় হেন কোন চেষ্টা নেই যা করেনি। ১৯৩৪ ইং সালে সৈয়দ আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারীর দল **'মজলিশে আহরারে ইসলাম'** কাদিয়ানের প্রতিটি ইট খুলে নেয়ার ঘোষণা দেয় এবং ১৯৫৩ ইং সালে **'জামা'তে ইসলামী'**-এর প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আবুল আলা মৌদুদী পাকিস্তানে দাঙ্গা বাঁধিয়ে আহমদীয়াতকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু আজ আমরা সবাই স্বাক্ষী যে, সেই অল্প শিক্ষিত, স্বল্প বয়সী যুবকটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট হয়ে এসব বিরোধীতা ও ফেতনা-ফ্যাসাদের তুফানকে শুধু প্রতিহতই করেন নি, বরং জামা'তকে তিনি আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় দিক থেকে উন্নতির এক সু-উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে বিরোধীরা সর্বদাই পরাজয়ের কালিমা মুখে লেপন করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে।

**তৃতীয়** খেলাফতের যুগেও কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। সেই সময়কার পাকিস্তানি সরকার প্রধান বলেছে, আহমদীদের হাতে ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়ে দিব কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে প্রাচুর্য দিয়েছেন। আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসার রোধ করার জন্য ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে অন্যায়ভাবে আহমদীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়। আহমদীদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলা হয়। সরকারের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ছিল কিন্তু জামা'তের উন্নতির পথে কোন বাঁধা দাঁড়াতে পারে নি। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন।

**চতুর্থ** খেলাফতের যুগে পাকিস্তান সরকার আরো কঠোরতা প্রদর্শন করে। ১৯৮৪ সনে যুগ খলীফাকে রাবওয়া থেকে লন্ডনে হিজরত করতে হয়। সেই পরীক্ষার সময়েও আল্লাহ্ তা'লা প্রশান্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জামা'ত উন্নতির নিত্য নতুন মাইল ফলক অতিক্রম করতে থাকে, তবলীগের নতুন নতুন পথ উন্মোচিত হয়, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পৃথিবীতে তবলিগী কার্যক্রম বিস্তৃত হতে থাকে।

**পঞ্চম** খেলাফতের যুগেও সেই নিত্যনতুন পথ আরো বিস্তৃত হয়। বিশ্বের কোটি কোটি লোকের কাছে জামা'তের বাণী পৌঁছে যায়। দু'একটি দেশের পরিবর্তে পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে এখন বিরোধীতা আরম্ভ হয়ে গেছে, এটিই আহমদীয়াতের সত্যতার প্রমাণ। এটিই উন্নতির লক্ষণ। আহমদীয়াত থেকে মানুষকে সরিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে উন্নতির পথ ক্রমশ প্রশস্ত করছেন। আর এসব কিছু থেকে এটিই প্রকাশ পায় যে, সাময়িক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ইসলামের বিজয় ইনশাআল্লাহ্ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে এবং তাঁর ইন্তেকালের পর প্রতিষ্ঠিত **'খেলাফত ব্যবস্থাপনা'**-র মাধ্যমেই সূচিত হবে। বিরোধীরা যতই চেষ্টা করুক তাদের অদৃষ্টে কেবল ব্যর্থতাই লিখা আছে।

নেযামে খেলাফতের স্থায়িত্ব, আশিস ও এর আনুগত্যের কল্যাণ সম্পর্কে আহমদীয়া জামা'তের পবিত্র খলীফাদের অভিব্যক্তি ও মতামত আপনাদের সামনে তুলে ধরছি:

খেলাফতের বরকত ও জামা'তের সদস্যদেরকে তাদের দায়িত্বাবলীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষন করতে গিয়ে হযরত 'খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল' (রা.) বলেন, **"মূসা (আ.)-এর জাতি এ ব্যাধির (অর্থাৎ অবাধ্যতার) কারণেই মরুভূমিতে ধ্বংস হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর জাতি সাবধানতা অবলম্বন করেছে আর সাফল্য পেয়েছে। এখন তৃতীয়বার তোমাদের পালা। কাজেই পরস্পর বিবাদ-বিতন্ডায় লিপ্ত হওয়া উচিৎ নয়। তোমাদের অবস্থা স্বীয় ইমামের হাতে তদ্রুপ হওয়া উচিৎ যেভাবে লাশ গোসলদাতার হাতে সমর্পিত থাকে। তোমাদের সকল ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্খা যেন বিলুপ্ত হয়ে যায় আর তোমরা নিজেদেরকে তোমাদের ইমামের সাথে এমন বন্ধনে আবদ্ধ কর, যেভাবে গাড়ী ইঞ্জিনের সাথে জুড়ে থাকে।"** *(খুতবাতে নূর, পৃ: ১৩১, ঈদুল ফিতরের খুতবা, জানুয়ারী ১৯০৩ খ্রি.)*

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, **"খেলাফতের অর্থই হচ্ছে খলীফার মুখ থেকে যখন কোন বাক্য নিঃসৃত হয়, তখন অন্য সব প্রকল্প, পরামর্শ ও পরিকল্পনাকে উপেক্ষা করে খলীফার আদেশের আনুগত্য করা। তখন মনে করতে হবে এখন সেসব প্রকল্প, পরামর্শ ও পরিকল্পনাই কল্যাণজনক যা খলীফা নির্দেশ করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত জামা'তের ভেতর এই চেতনা না জন্মাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সকল খুতবা মূল্যহীন, সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ এবং সকল প্রচেষ্টা নিরর্থক।"** *(খুতবাতে মাহমুদ, জুমুআ'র খুতবা: ২৪ জানুয়ারী ১৯৩৬ খ্রি.)*

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, **"খলীফার অনুগত্যের নির্দেশ মূলতঃ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, এর মাধ্যমে খোদা তা'লা তোমাদের উন্নতি ও সম্মান দিতে চান। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি তুমি তাদের আনুগত্য না করো, তাহলে তুমি ইবলিস হয়ে যাবে। যদি ইবলিস হতে না চাও, তাহলে তোমাকে খলীফার অনুগত্য করতে হবে। তোমাকে পূর্ণরূপে এবং সানন্দে তাঁর আদেশ পালন করতে হবে।"** *(খুতবা জুমু'আ- ১৭ই মার্চ ১৯৭২ খ্রি.)*

আহমদীয়া খেলাফতের সাথে পবিত্র বৃক্ষের সাদৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, **"আহমদীয়া খেলাফত কে আল্লাহ্ তা'লা কখনোই ধ্বংস হতে দিবেন না, বরং চির প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী রাখবেন। জীবন্ত, সতেজ, চিরযৌবনা এবং সর্বদা সৌরভে সুরভিত রেখে একে পবিত্র বৃক্ষরুপে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন। যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে- 'এটি এমন পবিত্র বৃক্ষ যার শেকড় মাটির গভীরে প্রোথিত এবং একে উপড়ে ফেলার মত ক্ষমতা বিশ্বের কোন শক্তিই রাখে না।' এটি কোন মন্দবৃক্ষ নয় যে যার মন চাইবে এটিকে উপড়ে অন্যত্র নিক্ষেপ করবে। এরূপ কোন ঝড়-ঝঞ্ঝা নেই যা একে স্বীয় স্থান থেকে হটাতে পারে। এর শাখা প্রশাখা উর্ধ্বলোকে আপন প্রভূর সাথে কথা বলছে। এটি এমন বৃক্ষ যা সদা পল্লবিত ও ফুলে ফলে সুশোভিত।"** *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল)*

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) বলেন, **"খেলাফতের দৃঢ়তার জন্য প্রত্যেক আহমদী দোয়া করুন যেন খেলাফতের আশীষ আপনাদের মধ্যে সর্বদা স্থায়ী হয়। নিজেদের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন আনয়ন করুন। নিষ্ঠা ও ঈমানে পূর্বাপেক্ষা অধিক উন্নত ও সমৃদ্ধ হোন। কারো একথা ভাবা উচিৎ নয় যে আমাদের বংশ, আমাদের দেশ বা আমাদের জাতিই আহমদীয়াতের পতাকাবাহী। এখন তিনিই আহমদীয়াতের পতাকাবাহী যিনি সৎকর্মশীল এবং খেলাফতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রক্ষাকারী।"** *(খুতবাতে মাসরুর)*

খোদা তা'লা এটি নির্ধারিত করে রেখেছেন যে, এখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত সব অঙ্গীকার আহমদীয়া খেলাফতের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করবে। খেলাফতের মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্বের উপর ইসলাম জয়যুক্ত হবে। এখন একমাত্র খেলাফতের মাধ্যমেই ইসলামের পুনর্জাগরন এবং পুনর্বাসন হবে। ধর্ম এখন খেলাফতের মাধ্যমেই পুনর্জীবন লাভ করবে এবং শরিয়তও খেলাফতের মাধ্যমেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। এখন এসব আশীষ থেকে তারাই অংশ লাভ করবে যারা খেলাফতের সাথে যুক্ত থাকবে। আর যারা খেলাফত থেকে বিমুখ হবে, তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্ত্বার সাথে সম্পৃক্ত সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

এখন খেলাফতের প্রতি আমাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু বলব। খেলাফত ব্যবস্থার জন্য আমরা আল্লাহ্ তা'লার কাছে যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কেন তা কম হবে। আমাদের দেহের প্রতিটি অনু-পরমানুও যদি আপাদমস্তক কৃতজ্ঞ হয়ে যায় তবুও আমরা এ মহা নেয়ামতের প্রকৃত কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারব না। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, **"লাইন শাকারতুম লাআযিদান্নাকুম"** অর্থাৎ যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে তোমাদের আরো বাড়িয়ে দিব। অতএব, এ বিষয়ে আমাদের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হচ্ছে আমরা এ নেয়ামতের সঠিক মূল্যায়ন করব এবং হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকব এবং নিজের জন্য দোয়া করব যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সৌভাগ্য দিতে থাকেন; আর এ কৃতজ্ঞতাকে কবুল করে স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খেলাফতের ছায়া সর্বদা আমাদের মাথার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

নবীর স্থলাভিষিক্ত হবার কারণে খলীফার মর্যাদা খুব উঁচু হয়ে থাকে। তাঁর মাধ্যমে পৃথিবীতে খোদার নূর ছড়াতে থাকে। এ পদে অধিষ্ঠিত হবার পর খোদার সাথে তাঁর এরূপ নৈকট্য সৃষ্টি হয় যে, খোদা তা'লা তাঁর দোয়া কবুল করে থাকেন। খোদা তা'লা স্বয়ং শিক্ষকরুপে তাকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করেন। এজন্য প্রতিটি মুমিনের খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে ব্যক্তিগত গভীর সম্পর্ক রাখা প্রয়োজন এবং প্রতিটি বিষয়ে নিয়মিত তাঁর কাছে দোয়ার আবেদন জানানো প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা যে এ যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে যুগ খলীফার সাথে যোগাযোগ খুব সহজ হয়ে গেছে। যে কেউ চিঠিপত্র, ইমেইল, ফ্যাক্স প্রভৃতির মাধ্যমে হুযূরের কাছে দোয়া চাইতে পারে। অনুরুপভাবে ব্যক্তিগতভাবে বা পরিবার নিয়েও হুযূরের সাথে সাক্ষাত করতে পারে। হুযূর বিভিন্ন দেশে যখন সফরে যান তখন সেখানকার অধিবাসীরা হুযুরের সাথে খুব সহজে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। খলীফায়ে ওয়াক্ত-এর সাথে সর্বদা সম্পর্ক জারী রাখা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

যুগ খলীফার কল্যাণময় সত্ত্বা সমগ্র জামা'তের জন্য সৌভাগ্য ও কল্যাণের ভান্ডার। তাঁর মকবুল (গৃহীত) দোয়া পুরো জামা'ত প্রতিটি মূহুর্তে লাভ করতে থাকে। এ অনুগ্রহের প্রতিদান তো কোনভাবেই দেয়া সম্ভব নয়। এজন্য সব নিষ্ঠাবান আহমদীর দায়িত্ব সর্বদা প্রিয় খলীফার জন্য দোয়া করতে থাকা এবং এ ব্যাপারে কখনো উদাসীন না হওয়া। মহানবী (সা.) বলেছেন, **"তোমাদের উত্তম নেতা সে, যাকে তোমরা ভালোবাস এবং সে-ও তোমাদেরকে ভালোবাসে। তোমরা তাঁর জন্য দোয়া কর এবং সে-ও তোমাদের জন্য দোয়া করে (মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ্)।"** যুগ খলীফার দোয়া তো আমরা সর্বক্ষণ পাচ্ছি, আমাদের এটি ভাবা উচিৎ যে, আমরাও কি যুগ খলীফার জন্য যথাযথভাবে দোয়া করছি?

কুরআন মজীদে মুমিনদের জামা'তের বৈশিষ্ট্য বর্নিত হয়েছে, **"সামে'না ওয়া আতা'না"** অর্থাৎ শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। মুমিনগণ সর্বদা পূণ্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে, বুঝে ও স্বরণ রাখে, অত:পর সেগুলো মন-প্রাণ দিয়ে পালন করে। আনুগত্যের প্রথম শর্ত হচ্ছে শুনা, এজন্য এটিকে প্রথমে রাখা হয়েছে। যে না শুনবে সে পালন করবে কিভাবে? হাদীসেও **"নেযামে জামা'ত"**-এর আনুগত্যের বিষয়ে স্পষ্ট আদেশ রয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, **"উ'সিকুম বিতাকওয়াল্লাহে ওয়াস্ সামেয়ে ওয়াত্তাআতে"** এ হাদীসে বলা হয়েছে, তাকওয়া অর্জনের দু'টি বড় উপায় হচ্ছে কান খুলে উপদেশ শুনা এবং তা পালন করা। *(তিরমিযি, কিতাবুল ঈমান)*

যুগ খলীফা আল্লাহ্ তা'লার অসাধারণ সাহায্য ও হেদায়াত লাভ করে থাকেন। তিনি খোদা তা'লার অনুমতি ও

পথনির্দেশে কথা বলেন। তাঁর পবিত্র মুখ থেকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ঝর্ণাধারা জারি হয়। তিনি সেসব বিষয়ের প্রতি মুমিনদের জামা'তকে আহবান করেন যা সময়োপযোগী এবং প্রত্যেক শ্রোতার জন্য খুবই উপকারী ও কল্যাণময়। অতএব, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর জুমুআ'র খুতবাসমূহ নিয়মিত ও পূর্ণ মনোযোগসহ শুনা, সন্তানদের শুনানো এবং বোঝানো প্রতিটি আহমদীর একটি মৌলিক দায়িত্ব। হুযুর আনোয়ারের অন্যান্য বক্তৃতা ও বাণীসমূহ শুনাও একান্ত আবশ্যক।

এতায়াত বা আনুগত্যের অর্থই হচ্ছে যুগ খলীফার পক্ষ থেকে আগত প্রতিটি নির্দেশে **'লাব্বাইক'** বলা। কোন নির্দেশ ভুলে যাওয়া বা কোনটির প্রতি মনোযোগ না দেয়া একজন আহমদীর বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেছেন, **'বয়াতের অর্থই হচ্ছে পূর্ণ আনুগত্য এবং খলীফার কোন একটি আদেশকেও অবজ্ঞা না করা।'** *(মাসিক আল-ফুরকান, রাবওয়া, খেলাফত সংখ্যা মে-জুন ১৯৬৭ খ্রি. পৃ: ২৮)*

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, **"খলীফা হচ্ছেন শিক্ষক আর জামা'তের প্রতিটি সদস্য হচ্ছে ছাত্র। খলীফার মুখ থেকে যে শব্দই বেরুবে তা পালনে যেন কোন ঔদাসিন্য না করা হয়"**। *(দৈনিক আল-ফযল, কাদিয়ান, ২মার্চ ১৯৪৬ ইং)*

তিনি (রা.) আরো বলেন, **"তোমরা সবাই ইমামের ইশারায় চল এবং তার পথনির্দেশ থেকে এক বিন্দুও এদিক ওদিক হইয়োনা। যখন তিনি আদেশ করেন অগ্রসর হও, আবার যখন তিনি আদেশ করেন থেমে যাও, যেদিকে যাবার আদেশ করেন সেদিকে যাও এবং যেখানে পিছু হটার আদেশ করেন সেখানে পিছু হট।"** *(আনোয়ারুল উলুম, চৌদ্দতম খণ্ড, পৃ: ৫১৫-৫১৬)*

অতএব, আমাদের প্রতিটি আহমদীর আবশ্যক দায়িত্ব যুগ খলীফার প্রতিটি তাহরীকে সাড়া দেয়া এবং এ ব্যাপারে কোনরুপ উদাসীনতা প্রদর্শন না করা।

খেলাফত ব্যবস্থার প্রতি মুমিনদের আরেকটি বড় দায়িত্ব হচ্ছে সে কেবল নিজেই নেযামে খেলাফতের সুরক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বক্ষেত্রে সেবা করতে প্রস্তুত থাকবে না বরং নিজ সন্তানদের ভেতরও এ আবেগ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করবে। আজকের শিশু ও যুবকগণ কাল জামা'তের পতাকাধারী প্রতিনিধি হবে। তাদের হৃদয়ে নেযামে খেলাফতের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে তাদেরকে এই কল্যাণময় নেযামের সাথে সম্পৃক্ত করা পিতামাতার অনেক বড় একটি দায়িত্ব। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তাঁর এক বাণীতে জামা'তকে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করেন। তিনি বলেন, **"আহমদীয়াত তথা ইসলামের দৃঢ়তা এবং প্রচার ও প্রসারের জন্য এবং নেযামে খেলাফতের জন্য শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চেষ্টা সাধনা করতে হবে এবং এজন্য বড় থেকে বড় ত্যাগ স্বীকারের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। নিজ সন্তানদের সর্বদা আহমদীয়া খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ দিতে হবে এবং তাদের হৃদয়ে যুগ খলীফার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে।"** *(মাসিক 'আন-নাসের', জার্মানী, জুন-সেপ্টেম্বর ২০০৩ ইং পৃ: ১)*

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে ঐশী খেলাফতের প্রতি অনুগত থেকে খলীফার প্রত্যেকটি কল্যাণময় নির্দেশ পালন করার সৌভাগ্য দান করুন। (আল্লাহুম্মা আমীন)

# ঐশী খেলাফত বনাম জাগতিক খেলাফত

মাওলানা সৈয়দ মোজাফ্ফর আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

পবিত্র কুরআন করীম ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত যে, প্রত্যেক যুগেই আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক প্রেরিত নবী-রসূলদের মৃত্যুর পর ঐশী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মহান আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন করীমে মুসলমানদের মাঝেও ঐশী খেলাফত প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি এভাবে প্রদান করেছেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

অর্থাৎ **তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে- আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের মধ্যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন যেভাবে তিনি খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন। এবং তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর এরপরও যারা অস্বীকার করবে তারাই দুস্কৃতিকারী।** *(সূরা আন নূর: ৫৬)*

অনুরূপভাবে হাদীসেও বলা হয়েছে-

مَا كَانَتْ نُبُوَّةٌ قَطُّ اِلَّا تَبِعَتْهَا خِلَافَةٌ

অর্থাৎ এমন কোন নবুয়্যত নেই, যার পরে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর মৃত্যুর পর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। *(কনযুল উম্মাল)*

শুধু তা-ই নয়, বরং পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ যুগে আগমণকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর মৃত্যুর পরও খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আহমদ-বায়হাকী ও মিশকাত শরীফের একটি দীর্ঘ হাদীসে যেভাবে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম জাতির সামগ্রিক অবস্থা বর্ণিত হওয়ার পর সেই হাদীসের শেষাংশে একথা বলা হয়েছে যে, তখন পুনরায় নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অত:পর মহানবী (সা.) চুপ হয়ে গেলেন। এদ্বারা বুঝা যায় যে, এই খেলাফত কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা নবী নির্বাচন করে থাকেন, কুরআনের ভাষায়- إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً অর্থাৎ **নিশ্চই আমি (আল্লাহ্) পৃথিবীতে খলীফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে যাচ্ছি।** *(সূরা আল বাকারা: ৩৪)*

এরূপ খলীফাকে ইসলামী পরিভাষায় **'খলীফাতুল্লাহ'** বা আল্লাহ্র খলীফা বলা হয়ে থাকে। তদ্রুপ নবীর মৃত্যুর পরেও স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লাই **'খলীফাতুর্ রাসূল'** বা নবীর খলীফাকে নির্বাচিত করে থাকেন। কিন্তু এক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন হয়ে থাকে অর্থাৎ নবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামা'তে খেলাফত প্রতিষ্ঠার সময় সেই সকল সদস্য যারা ঈমান ও পূণ্যকর্মের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকে তাদেরকে পুরষ্কারস্বরূপ রায় প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে। বাহ্যত এটি একটি সাধারণ নির্বাচন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে খোদা তা'লাই তা নির্বাচন করে থাকেন। মুমিনদের পবিত্র হৃদয় তাকেই খলীফা নির্বাচন করে যাকে মূলত আল্লাহ্ তা'লা নির্বাচন করে থাকেন। আর সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াতে (আয়াতে ইস্তেখলাফে) لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ শব্দের মাধ্যমে এই বিষয়টিই বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াত অর্থাৎ **'আয়াতে ইস্তিখলাফ'**-এ ঐশী খেলাফত ও জাগতিক খেলাফতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। **প্রথমতঃ** ঐশী খেলাফত তাদের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হবে যারা ঈমান ও পূণ্যকর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত

থাকবে, অর্থাৎ ঈমান ও পূণ্যকর্ম হচ্ছে প্রধান দুটি শর্ত। জাগতিক খেলাফতের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় না।

**দ্বিতীয়তঃ** ঐশী খেলাফতের দুটি প্রধান কল্যাণের কথা এই সূরায় বর্ণিত হয়েছে। যথা : (১) ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও (২) ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তিতে পরিণত করা, যা জাগতিক খেলাফতের মাধ্যমে কখনোই অর্জিত হতে পারে না এবং অদ্যবধি এমনটি হয়ও নি।

**তৃতীয়তঃ** খেলাফত প্রতিষ্ঠার দু'টি মহান উদ্দেশ্যের কথাও এই সূরাতে বর্ণিত হয়েছে। যথা: **(১) আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা ও (২) খোদা তা'লার একত্ববাদকে প্রকৃত অর্থেই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা।** আর জাগতিক খেলাফতের ক্ষেত্রে এর বিপরীত অবস্থাই হয়ে থাকে।

ঐশী খেলাফত প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, **"যাকে খোদা তা'লা খলীফা মনোনীত করেন এমন কেউ নেই যে তাঁর কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। তাঁকে এক বিশেষ শক্তি ও মর্যাদা প্রদান করা হয়ে থাকে।"** *(আল ফযল, ২৫ মার্চ, ১৯৪১ ইং)*

এরই ভিত্তিতে আমরা যদি ইসলামী খেলাফতকে বিচার-বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অন্তর্ধানের পর সাহাবাগণ অত্যন্ত ব্যথিত, চিন্তিত ও দিক-ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'লা খেলাফতে রাশেদার ভিত্তি রাখেন। যখনই সাহাবাগণ হযরত আবু বকর (রা.) [৮ জুন, ৬২৩ - ২২আগস্ট, ৬৩৪] কে **'খলীফাতুর্ রাসূল'** হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর (রা.) হাতে বয়াত করেন তখনই তাদের ব্যাথাতুর হৃদয়ে এক প্রশান্তির অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং একটি পতনোন্মুখ জামা'ত পুনরায় তার নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে যায়। যা প্রমাণ করে এটি একটি ঐশী খেলাফত ছিল। এরপর পর্যায়ক্রমে হযরত উমর (রা.) [২৩ আগস্ট, ৬৩৪খ্রি. - ৩ নভেম্বর, ৬৪৪ খ্রি.], হযরত উসমান (রা.) [১১ নভেম্বর, ৬৪৪খ্রি. - ২০ জুন, ৬৫৬খ্রি.] ও হযরত আলী (রা.) [২০ জুন, ৬৫৬খ্রি. - ২৯ জানুয়ারী, ৬৬১খ্রি.] সফলতার সাথে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন। যদিওবা তাঁদের খেলাফতকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভয়ংকর ফিৎনা মাথাচাঁড়া দিয়ে উঠেছিল কিন্তু আয়াতে ইস্তিখলাফে আল্লাহ্ কর্তৃক কৃত অঙ্গীকার অনুযায়ী সকল ভয়-ভীতির অবস্থা শান্তিতে পরিণত হয়েছে এবং ইসলামের অসাধারণ দৃঢ়তা ও প্রসারতা অর্জিত হয়েছে।

শুধু তা-ই নয়, বরং আল্লাহ্র রসূল (সা.) তাঁর মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠিত ঐশী খেলাফতের সময়কাল পর্যন্ত আমাদের জানিয়ে গিয়েছেন। তিনি (সা.) ইরশাদ করেছেন-

اَلْخِلَافَةُ ثَلَاثُوْنَ عَامًا ثُمَّ يَكُوْنُ بَعْدَ ذٰلِكَ الْمُلْكُ

অর্থাৎ, **আমার পর প্রতিষ্ঠিত খেলাফত ত্রিশ বছর জারী থাকবে। এরপর বাদশাহী যুগের বা জোড়-জবরদস্তিমূলক রাজত্বের সূচনা হবে।** *(মুসনাদ আহমদ, খন্ড-৫)*

আমরা দেখতে পাই, ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ত্রিশ বছর পর্যন্ত (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) ইসলাম ঐশী খেলাফতের অধীনে দেদীপ্যমান সূর্যের ন্যায় চমকাতে থাকে। এরপর হযরত আলী (রা.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হযরত হাসান (রা.) খেলাফতের মনোনয়ন পান। কিন্তু তিনি খলীফা হতে পারেন নি। তিনি বিদ্রোহ দমন করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি করেন। সন্ধির শর্ত ছিল, মুয়াবিয়া পাবে খেলাাফতের দায়িত্ব তবে সেটা রাজ্য চালনার জন্য এবং মুয়াবিয়া তার পরে অন্য কাউকে খলীফা মনোনয়ন দিতে পারবে না এবং হযরত হাসানের মৃত্যুর পরও তিনি সাম্রাজ্য বানাতে পারবেন না। কিন্তু মুয়াবিয়া দ্বিতীয় শর্তটি ভঙ্গ করেন। তিনি তার পুত্র প্রথম ইয়াজিদকে তার পরবর্তী খলীফা হিসেবে ঘোষণা দেন। এভাবে হযরত আলীর পর **'খোলাফায়ে রাশেদীন'**-এর ধারার সমাপ্তি ঘটে এবং আমীর মুয়াবিয়ার মাধ্যমে **উমাইয়া খেলাফতের** সূচনা হয় (৬৬১-৬আগস্ট,৭৫০)। আর এই খেলাফত মূলত উমাইয়া রাজবংশকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে। আর এভাবে বাদশাহাতের আওতায় খেলাফতের ধারার সূচনা হয়। যা ছিল মূলত জাগতিক খেলাফত।

এরপর আব্বাসীয় পরিবার কর্তৃক পরিচালিত **হাশিমিয়া আন্দোলন** উমাইয়া খেলাফতকে উৎখাত করে আর আব্বাসীয় খেলাফতের সূচনা হয় (১৫ জানুয়ারী, ৭৫০ খ্রি. - ২০ ফেব্রুয়ারী, ১২৫৮ খ্রি.)। কিন্তু ৭৫৬ থেকে উমাইয়া শাসিত ইবেরিয়ান উপদ্বীপ ও উত্তর আফ্রিকার কিছু অংশে তারা স্বীকৃত ছিলেন না। আব্বাসীয় শাসনের শেষের দিকে মুসলিম শাসকরা সুলতান বা অন্যান্য উপাধি ব্যবহার শুরু করেন।

এরপর **মামলুক আব্বাসীয় রাজবংশের** সূচনা হয় (১২৬১-১৫১৭)। এ সময় কায়রোর আব্বাসীয় খলীফা (১৩ জুন, ১২৬১ খ্রি. - ২২ জানুয়ারী, ১৫১৭ খ্রি.) মূলত মামলুক সালতানাতের পৃষ্ঠপোষকতায় আনুষ্ঠানিকভাবে খলীফা ছিলেন।

১৫১৭ সনে প্রথম সেলিমের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে মামলুক সালতানাতের সমাপ্তি ও উসমানী খেলাফতের সূচনা হয় (১৫১৭-৩ মার্চ, ১৯২৪ খ্রি.)। এদের শাসকদেরকে সুলতান বলে ডাকা হতো। পরবর্তীতে প্রজাদের কাছ থেকে

পাওয়া উপাধি ব্যবহার শুরু করে। ১৯০৮ সনে উসমানী সাম্রাজ্যের সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের ক্ষমতা-চ্যুতির সাথে সাথে খেলাফতের কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায়।

১৯০৮ থেকে শুরু করে পরবর্তী সময় উসমানীয় সুলতানরা নির্বাহী ক্ষমতাবিহীন সাংবিধানিক সম্রাট হিসেবে বিবেচিত হতেন। এ সময় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত পার্লামেন্ট ক্ষমতা ভোগ করতো। পরবর্তীতে ১৯২২-১৯২৪ পর্যন্ত দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ তুরস্ক প্রজাতন্ত্র ও এর রাষ্ট্রপতি কামাল আতাতুর্কের পৃষ্ঠপোষকতায় আনুষ্ঠানিকভাবে খলীফা ছিলেন। এরপর ৩ মার্চ, ১৯২৪ সনে খলীফার অফিস 'গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীর' কাছে হস্তান্তর করা হয়। খলীফার অফিস বিলুপ্তির পর তুরস্কের **'গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী'** রাষ্ট্রে ইসলামের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে আলাদা কার্যালয় স্থাপন করে। এভাবে বৈশ্বিক খেলাফতের ধারা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

পরবর্তীতে ১৯২৪ সনের ১১ মার্চ খলীফার পদ পুনরায় প্রতিষ্ঠার জন্য হুসাইন বিন আলীর পক্ষ থেকে শেষ চেষ্টা করা হয়। তিনি ছিলেন হেজাজের রাজা ও মক্কার শরীফ। ১৯২৪ সনের ৩ মার্চ তিনি খেলাফত দাবী করেন এবং ৩ অক্টোবর পর্যন্ত তা বজায় ছিল। এরপর তিনি তার পুত্র আলী বিন হুসাইনকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন, কিন্তু আলী বিন হুসাইন খলীফার উপাধি ধারণ করেন নি।

কিন্তু এটিও আমাদের জানা থাকা উচিত যে, বৈশ্বিক খেলাফত থাকাকালেও বিভিন্ন অ-বৈশ্বিক খেলাফতও পাশাপাশি চলমান ছিল। ৬৮৪ সনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের উমাইয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা দেন। মক্কায় তিনি খলীফা ঘোষিত হন। কিন্তু ৬৯২ সনে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ছয় মাস ব্যাপী অবরোধের পর পরাজিত ও নিহত হন।

আবার ৯২৯ খ্রি. - ১০৩১ খ্রি. পর্যন্ত কর্ডোভার উমাইয়া খেলাফত স্পেন ও পশ্চিমা বিশ্বে রাজত্ব করেছে, কিন্তু বিশ্বব্যাপী তাদের স্বীকৃতি ছিল না। তদ্রুপ ৯০৯খ্রি.-১১৭১খ্রি. পর্যন্ত ফাতেমীয় খেলাফতও প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরা শিয়াদের ইসমাঈলী শাখা থেকে উদ্ভূত। সুন্নীদের কাছে এদের কোন স্বীকৃতি নেই।

অনুরূপভাবে **'আলমোহাদ খেলাফত'** উত্তর আফ্রিকার অংশবিশেষ ও ইবেরিয়ান উপদ্বীপে কার্যকর ছিল। এভাবে বৈশ্বিক খেলাফতের পাশাপাশি কিছু অ-বৈশ্বিক বা আঞ্চলিক খেলাফতও প্রতিষ্ঠিত ছিল।

অতএব, আমীর মুয়াবিয়ার এবং তার পুত্র ইয়াজিদের আমল থেকে শুরু করে বাদশাহাত বা রাজতন্ত্রের অধীনে যে খেলাফতের ধারা প্রবাহিত হয়েছিল তা মুসলিম সালতানাত বা সাম্রাজ্য সমূহের উত্থান-পতনের আবর্তে কখনো এক এবং কখনো একাধিক ধারায় দামেস্ক, বাগদাদ, কায়রো ও কর্দোভার যমিনের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে শুষ্ক হয়ে গেছে তুরস্কের যমিনে ১৯০৮ সনে উসমানী সাম্রাজ্যের সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের ক্ষমতা-চ্যুতির সাথে সথে।

পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের উদ্দেশ্যে খেলাফত রক্ষা ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। এরই প্রেক্ষিতে ১৯২০ সনে খেলাফত কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু যেহেতু তদানীন্তন মুসলিম আলেম সম্প্রদায় খেলাফত বলতে তুরস্ক সালতানাতের খেলাফতকে বুঝতেন, এজন্য তুরস্কের বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহকে ইসলামী খেলাফত ও ঐক্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলেই গণ্য করতেন, বিধায় মক্কার শরীফ হোসেনের বিদ্রোহকে সমর্থন না করে বিরোধীতা করেছে।

শুধু তা-ই নয়, বরং গান্ধীজি স্বয়ং হিন্দুধর্মের 'গাভী মাতা-র' ন্যায় এই খেলাফত আন্দোলনকে 'মুসলিম গাভী' ধারণা করে মুসলমানদের সহায়তা করার সদিচ্ছা প্রকাশ করেই **'খেলাফত আন্দোলন'**-কে কংগ্রেসের স্বরাজ আন্দোলনের সঙ্গে একীভূত করে ফেলেন। সে সময় বিভিন্ন আন্দোলনে ভারতবর্ষের অবস্থা টালমাটাল ছিল। যেমন: **স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য আন্দোলন, হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ইত্যাদি**। পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলন যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন খেলাফত আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে আসে। আর ১৯২৪ সনে যখন তুরস্কে কামাল পাশাদের মাধ্যমে খেলাফতের অবসান ঘোষণা করা হয় তখন হিন্দুস্থানের খেলাফত আন্দোলনেরও চিরসমাপ্তি ঘটে। এরপর আজ অব্দি মুসলিম জাহানের উপর কোন খেলাফতের ছায়া নেই। কোন একক নেতৃত্ব নেই। তাহলে কি খেলাফতের পদ্ধতি রহিত হয়ে গেছে? উত্তর হচ্ছে– না, হয় নি।

প্রকৃত বিষয় হল, খোলাফায়ে রাশেদার পর যে খেলাফতের ধারা বাদশাহাতের আওতায় পরিচালিত হয়েছিল তা ছিল মূলত জাগতিক বা কৃত্রিম খেলাফত। কিন্তু খেলাফতের ঐশী ধারাটি মূলত মুজাদ্দেয়াতের ধারায় পরিবর্তিত হয়ে প্রবাহিত হয়ে যায়। এই বিষয়ে স্বয়ং রসূলে করীম (সা.) বলে গিয়েছেন যে,

إِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا۔

অর্থাৎ, **নিশ্চয় প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে আল্লাহ্ তা'লা এই উম্মতের জন্য এমন মহাপুরুষকে আবির্ভূত করবেন, যিনি তাদের জন্য ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন**। *(আবুদাউদ, কিতাবুল মাহদী; মিশকাত, কিতাবুল ইলম)*।

উম্মতে মুসলেমা ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ধর্ম-সংস্কারক মহাপুরুষগণকে মেনে এসেছেন, কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদকে সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। চতুর্দশ শতাব্দীতেও একজন দাবীকারক ছিলেন, কিন্তু তারা তাকে নানা অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যার ফলে তারা আজ খেলাফতবিহীন, একক নেতৃত্বহীন ছন্নছাড়া জীবন অতিবাহিত করছে। কেননা চতুর্দশ শতাব্দীতে আগমণকারী মহাপুরুষকে স্বয়ং রসূলে করীম (সা.) উম্মতী নবী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাঁরই মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা.)-এর দ্বিতীয় আগমণ পূর্ণতা লাভ করেছে। আর তাঁর মাধ্যমেই শেষ যুগে মুসলমানদের মাঝে ঐশী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার ভবিষ্যদ্বাণীও স্বয়ং রসূলে করীম (সা.) করে গিয়েছেন। আজ চতুর্দশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে পঞ্চদশ শতাব্দী চলছে, অথচ দাবীকারক কেবলমাত্র একজন, যিনি হচ্ছেন **হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)**। আর তাঁর (আ.) তিরোধানের পর তাঁর (আ.) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে আজ পঞ্চম খেলাফত চলছে এবং ইনশাআল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত তা জারি থাকবে।

আজ এই খেলাফতের বয়স ১১২ বছর। প্রতিনিয়ত শত্রুরা এই জামা'তকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস চালিয়েছে এবং এখনো চালাচ্ছে, কিন্তু আয়াতে এস্তেখলাফের ওয়াদা অনুযায়ী প্রতিটি আক্রমণ ও ভয়ভীতির অবস্থার পর আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'তকে পূর্বের চেয়েও আরো বেশি দৃঢ়তা দান করেছেন, ঈমান ও আমলে উন্নতি দান করেছেন। যতই এই জামা'তকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়েছে ততই এই জামা'ত আরো বেশি ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে পৃথিবীময় বিস্তৃতি লাভ করেছে। আর আজ বিশ্বের ২১৬ টি দেশে আহমদীয়াত বিস্তৃতি লাভ করেছে।

আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে ঐশী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও কতিপয় জগতপূজারী লোক খেলাফত প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও চালিয়েছিল। কিন্তু তারা সফলকাম হয় নি। কেননা, খলীফা আল্লাহ্ বানান, মানুষ নয়। অতিশয় উচ্চাভিলাষী ভুট্টো চেয়েছিল, সে নিজে হবে মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক নেতা এবং বাদশাহ ফয়সাল হবে ইসলামী বিশ্বের খলীফা বা **'খলীফাতুল মুসলেমীন'**। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত **'ইসলামী সম্মেলন সংস্থা'** তথা OIC এর শীর্ষ সম্মেলনে উগান্ডার ইদী-আমীনের মাধ্যমে বাদশাহ ফয়সালকে মুসলিম বিশ্বের খলীফা মনোনীত করার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্র জামা'ত ও খেলাফতের মোকাবেলায় দণ্ডায়মান হওয়ার পরিণতিতে তার খলীফাতুল মুসলেমীন হবার সাধ পূর্ণ হবার পূর্বেই অজ্ঞাতকারণে আকস্মিকভাবে তার ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে সে নিহত হয় এবং মুসলিম বিশ্বের নেতা হবার পূর্বেই খুনের দায়ে জুলফিকার আলী ভুট্টোর ফাঁসি হয়। অত:পর পাকিস্তানী ইসলামাইজেশনের কর্নাধার জিয়াউল হক আহমদীয়া জামা'তের চতুর্থ খলীফার মোবাহালার চ্যালেঞ্জের নিমিত্তে আকাশেই রহস্যজনকভাবে বিমান বিস্ফোরিত হয়ে মারা যায়।

সুতরাং আল্লাহ্র কসম খেয়ে প্রত্যাদিষ্ট হবার দাবী করা এবং তাঁর মৃত্যুর পর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়া একথা প্রমাণ করে যে, এই জামা'ত অর্থাৎ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সত্য, এই জামা'তের খেলাফত সত্য, খলীফা সত্য এবং এটি একটি ঐশী খেলাফত। ঐশী খেলাফত তথা ঐশী জামা'তের সকল বৈশিষ্ট্য এই জামা'তে বিদ্যমান। কেননা এক নেতা, এক কেন্দ্র তথা খেলাফত, বায়তুল মাল, ভাতৃত্ব বন্ধন, তবলীগী কাজ বাস্তবায়ন ইত্যাদি সব কিছুই এই জামা'তে বিদ্যমান। শেষ যুগে সত্য ও ঐশী জামা'তের লক্ষণ সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.)-এর এই উক্তি مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِي (তিরমিযি, কিতাবুল ঈমান)-এরই সত্যায়ন। অর্থাৎ যে অবস্থা ও ব্যবস্থা এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমি ও আমার জামা'ত অতিবাহিত হচ্ছি একই অবস্থা শেষ যুগে সত্য জামা'তের মধ্যেও থাকবে। এখন আপনারাই সমীকরণ মিলিয়ে নিন যে, বর্তমানে কারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত? আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নাকি অন্যান্য সাধারণ মুসলমানগণ? এই জামা'ত যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এই জামা'তে প্রতিষ্ঠিত খেলাফতও সত্য ও ঐশী খেলাফত।

জামা'তে আহমদীয়ার খলীফা-ই আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক মনোনীত খলীফা। এই সেই খেলাফত যার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে প্রদান করেছেন এবং হযরত রসূলে করীম (সা.)ও এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন । এই সেই ঐশী খেলাফত যার কল্যাণেই মুক্তি আসবে সকল মুসলমানের, মুক্তি আসবে বিশ্ব-মানবতার। এটাই আল্লাহ্র ইচ্ছা, এটাই তাঁর অঙ্গীকার।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এই ঐশী খেলাফতের মাধ্যমে বরকতমণ্ডিত হবার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

# ঐশী খেলাফত ও আমাদের দায়-দায়িত্ব

মাওলানা নাসের আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

পবিত্র কুরআন করীমে মু'মিনদের মাঝে খেলাফত প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অঙ্গীকার রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াতে বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

অর্থাৎ **"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে, তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'লা অঙ্গীকার করেছেন যে, নিশ্চয় তিনি পৃথিবীতে তাদের মধ্যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন। যেভাবে তিনি খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীন কে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির অবস্থা পরিবর্তন করে দিবেন।"** *(সূরা নূর, আয়াত: ৫৬)*

সুতরাং প্রথমে জানা প্রয়োজন খলীফা কী? **'খলীফা'** আরবী শব্দ। এটি কুরআন, হাদীস ও ধর্মীয় সাহিত্যে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। খলীফা শব্দের মূল ধাতু হচ্ছে **খা-লাম-ফা** অর্থাৎ খাল্‌ফ। এই খাল্‌ফ থেকে খলীফা শব্দটি এসেছে। এর অর্থ **'স্থলাভিষিক্ত'**। একজন চলে গেলে যে তার স্থান প্রাপ্ত হন তিনি তার খলীফা বলে পরিচিত হন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, **"খলীফা তাকে বলে যিনি একজনের পেছনে আসেন এবং তার স্থলাভিষিক্ত হন"** (বদর পত্রিকা, কাদিয়ান, ৬ জুলাই ১৯০৫ খ্রি.)। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেন, **"খলীফা অর্থ স্থলাভিষিক্ত হয়ে যিনি আল্লাহ্‌র ধর্মকে উজ্জীবিত করেন। নবীগণের অন্তর্ধানের পর অন্ধকার বিস্তার লাভ করে। এই অন্ধকার দূর করার জন্য যারা নবীর স্থলাভিষিক্ত হন তাদেরকে খলীফা বলা হয়।"** *(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৩)*

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী হযরত মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) তাঁর **'তফসীরে কবীর'** গ্রন্থে সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় খলীফা শব্দের অর্থ লিখেন, **"খলীফা অর্থ স্থলাভিষিক্ত। যেমন হযরত মূসা (আ.) যখন চল্লিশ দিনের জন্য নিজ জাতির লোকদের ছেড়ে আল্লাহ্‌র আদেশে অন্যস্থানে গেলেন তখন হযরত হারুন (আ.)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে গেলেন। বলে গেলেন, 'উখলুফনি ফি কাওমি' অর্থাৎ তুমি আমার জাতির মাঝে (আমার অবর্তমানে) আমার প্রতিনিধিত্ব কর।"** *(সূরা আরাফ, আয়াত: ১৪৩)*

হযরত ইমাম আল্লামা বায়যাভি তাঁর তফসীরে লিখেছেন, **"খলীফা তিনি যিনি অন্য একজনের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং নায়েব হিসেবে কাজ করেন।"** সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট যে, নবীর ইন্তেকালের পরে যিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তিনিই তাঁর খলীফা।

বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে **'আশরাফুল মাখলুকাত'** অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ প্রেরণ করার ধারা চলমান রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মানুষের হেদায়াতের জন্য দু'ধরণের খলীফা নির্বাচন করেন। এর মধ্যে প্রথমটি হল **'খলীফাতুল্লাহ'** অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা সরাসরি বিশেষ ওহীর মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে **মা'মুর** অর্থাৎ নবী নির্বাচন করেন। নবীগণ আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হন। তাদেরকে কুরআন করীমে **'খলীফাতুল্লাহ'** বলা হয়েছে। যেমন হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা সূরা বাকারার ৩১ নং আয়াতে বলেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

অর্থাৎ **'এবং স্মরণ কর যখন তোমার প্রভু ফিরিশতাগণকে বললেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি'**।

একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা হযরত দাউদ (আ.) সম্পর্কে সূরা সাদের ২৭ নং আয়াতে বলেন,

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ

অর্থাৎ **'হে দাউদ! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি'**। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এসকল মনোনীত

নবী-রসূলদের মাধ্যমে হেদায়াতের বৃক্ষ রোপন করেন। এ বৃক্ষ দিন দিন বড় হতে থাকে। এটি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মানুষকে হেদায়াত দেয়ার **'কুদরতে উলা'** অর্থাৎ প্রথম কুদরত।

আল্লাহ্ তা'লার চিরাচরিত নিয়ম হল, যখনই নবী রাসূলগণের পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার সময় আসে তখন তার উপর অর্পিত সকল কাজকে পরিপূর্ণ করার জন্য, তার রোপিত বাগানে পানি সিঞ্চনের ও নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষনের জন্য খোদা তা'লা পুনরায় তাঁর কুদরত প্রকাশ করেন। আল্লাহ্ তা'লার ইশারায় মু'মিনগণ নিজেদের মধ্য হতে একজনকে খলীফা নির্বাচন করেন যা মূলত খোদা তা'লারই নির্বাচন। আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছায় সেই ব্যাক্তির মাথায় খেলাফতের মুকুট পড়ানো হয়। আর একে **'খলীফাতুর রসূল'** বলা হয়। এটি হল **কুদরতে সানীয়া** অর্থাৎ দ্বিতীয় কুদরত।

নবীর মৃত্যুর পর বিভিন্ন ধরনের বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং বিরুদ্ধবাদীরা মনে করতে শুরু করে যে, নবীর কাজ বিফলে গেছে। আল্লাহ্‌র নবীর দ্বারা গঠিত জামা'ত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমনকি নবীর জামা'তের লোকজনও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে, তাদের কটিদেশ ভেঙ্গে যায়, কোন কোন দুর্ভাগা মুর্তাদ হয়ে যায়। এমন সময়ে খোদা তা'লা আপন মহাশক্তি প্রকাশ করেন এবং পতনোম্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন। জামা'তের এই রুহানী নেতা নবীর পর তাঁর কাজকে বেগবান করে পূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্যের ছায়ায় কাজ করতে থাকেন। এ সম্পর্কে নবী করীম (সা.) বলেছেন,

مَا كَانَتْ نُبُوَّةٌ قَطُّ اِلَّا تَبِعَتْهَا خِلَافَةٌ

অর্থাৎ **'পৃথিবীতে এমন কোন নবী আসেনি যাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় নি।'** *(কানযুল উম্মাল, ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা: ১০৯)*

সুতরাং রসূলে করীম (সা.)-এর হাদীস থেকে আমরা দেখতে পাই খেলাফত এতটাই জরুরী যে প্রত্যেক নবীর ইন্তেকালের পরপরই তাঁর জামা'তের জন্য আল্লাহ্ তা'লা খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেছেন। নবীর সত্যতার একটি অকাট্য ও জলন্ত প্রমান হল এই খেলাফত আর আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এর প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিয়েছেন।

যদিও নবুয়্যত এবং খেলাফত দুটি ব্যবস্থাই আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে কিন্তু এদের মাঝে একটি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। নবীর আগমন তখন ঘটে যখন পৃথিবী অপরাধ ও বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সকল দিকে শির্ক ও অন্ধকারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এমন সময় আল্লাহ্ তা'লা তাঁর **'কুদরতে উলা'** অর্থাৎ প্রথম কুদরত প্রকাশ করে নবী প্রেরণ করেন। আর নবীর মৃত্যুর পর যখন নবীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি জামা'ত থাকে, যারা ঈমানের বলে বলিয়ান ও পূণ্যকর্ম সম্পাদনকারী হয়, তাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর **'কুদরতে সানীয়া'** অর্থাৎ দ্বিতীয় কুদরত প্রকাশ করে খলীফা নিযুক্ত করেন।

এ জন্যই নবী এবং খলীফা নির্বাচনের পদ্ধতিতে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নবীর নির্বাচন আল্লাহ্ তা'লা সরাসরি করেন। কেননা অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই যুগে মুমিনদের জামা'তের কোন অস্তিত্বই থাকে না। কিন্তু নবীর আগমনের পর মুমিনদের একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয় আর নবীর মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহস্বরূপ সেই জামা'তের মাঝে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহ্ তা'লা মুমিনদের পুরষ্কার হিসেবে এই সম্মান প্রদান করেন যে তারা খলীফা নির্বাচনের সময় নিজেদের রায় প্রকাশ করার সুযোগ পায়। বাহ্যত এটি একটি নির্বাচনরুপে দেখা গেলেও প্রকৃত অর্থে এটি খোদারই নির্বাচন। মুমিনদের পবিত্র হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার কুদরত বা নিয়তির অনুসরণ করে সেই পবিত্র সত্ত্বাকে নির্বাচন করেন যা মূলত খোদারই নির্বাচন হয়ে থাকে। আয়াতে ইসতেখ্‌লাফে لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم শব্দে এই বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে নির্বাচনের মধ্যে একটি হিকমত রয়েছে, যেসকল মুমিন এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন তারা নির্বাচিত খলীফার আনুগত্যকারী হবে ও তাঁর প্রত্যেক কথায় লাব্বাইক বলবে।

একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয় যে, ঐশী খেলাফত ব্যবস্থার প্রত্যেক খলীফা তার পূর্বের নবীর খলীফা হয়ে থাকে। নিজের পূর্ববর্তী খলীফার কোন খলীফা হয় না। এজন্যই এমন খলীফাকে **'খলীফাতুর রসূল'** বলা হয়। আর যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা **'আহমদীয়া খেলাফত'** যুগের মসীহ্‌র পরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাই জামা'তে আহমদীয়ার প্রত্যেক খলীফাকে **'খলীফাতুল মসীহ্'** বলা হয়।

পৃথিবীতে এমন অনেক জামা'ত বা সংগঠন নিজেদের মাঝে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে কারণ খলীফা বানানো কোন মানুষের সাধ্যের মধ্যে নেই, খলীফা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা নির্বাচন করেন। আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা ব্যতীত কারো পক্ষে খলীফা বানানো অসম্ভব।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক মনোনীত ইমাম মাহদী। তিনি ২৬ মে ১৯০৮ইং তারিখে ইন্তেকাল করেছেন। ২৭ মে ১৯০৮ ইং তারিখে হযরত মাওলানা আলহাজ্জ হেকীম নূরুদ্দীন (রা.) হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। **আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের**

মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা খেলাফত কায়েম করে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, এ জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) সত্য-সত্যই আল্লাহ্‌র প্রেরিত ও মনোনীত ইমাম মাহ্‌দী ছিলেন। বর্তমানে পৃথিবীতে কোন জামা'ত যদি আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে নিজেদের ঈমানের দাবীতে সত্য হয়ে থাকে এবং এমন কোন জামা'ত যদি থেকে থাকে যাদের কর্মকান্ড আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে পূণ্যকর্ম বলে বিবেচিত তাহলে সেই জামা'ত একমাত্র **"আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত"**।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে নিয়ামত অর্থাৎ ঐশী খেলাফত দান করেছেন, এ অবস্থায় আমাদের দায়-দায়িত্ব কী তা জেনে সে অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করা আবশ্যক। এ জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারবো না ততক্ষন পর্যন্ত এগুলোর উপর আমরা আমলকারী হতে পারবো না।

ঐশী খেলাফতের সাথে আমাদের দায়-দায়িত্ব কী? এ সম্পর্কে জানার জন্য প্রথমেই দেখা দরকার আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফাগণ যারা যুগের ঈমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খলীফা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন আর যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সম্পদে বলিয়ান করেছেন, এই মনোনীত বান্দাগণ জামা'তের সদস্যদেরকে খেলাফতের বিষয়ে তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে কি বলেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউওয়াল (রা.) বলেন, আমার ওসিয়্যত হলো, **"হাবলুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার রজ্জুর সাথে তোমাদের সম্পর্ক যেন দৃঢ় হয়। নিজেদের মাঝে কোন ঝগড়া বিবাদ করো না; কেননা ঝগড়া বিবাদ আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের আগমনকে বাঁধাগ্রস্থ করে। তোমাদের সাথে ইমামের এমন সম্পর্ক হওয়া উচিত, যেমনটি গোসলদাতার হাতে লাশের হয়। তোমাদের সকল আশা আকাঙ্খা যেন মৃত হয়। তোমরা নিজেদেরকে ইমামের সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত কর যেভাবে ইঞ্জিনের সম্পর্ক গাড়ির সাথে থাকে। প্রতিদিন আত্মবিশ্লেষণ কর যে, তোমরা নিজেদেরকে অন্ধকার থেকে বের করতে পেরেছ কি না?"** *(খুতবাতে নুর, পৃষ্ঠা: ১৩১)*

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, **"এই কথাটি খুব ভালভাবে মনে রেখো যে, খলীফা হলো হাবলুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার রশি আর এটি এমন রশি যা ধরে তোমরা উন্নতি করতে পারবে। যে একে ছেড়ে দেবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।"** *(দারসুল কুরআন, ১লা মার্চ ১৯২১)*

আমাদের প্রিয় নেতা সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) যাকে আল্লাহ্ তা'লা বর্তমান যুগে খেলাফতের মুকুট পরিয়েছেন, তিনি জামা'তে আহমদীয়ার উন্নতির জন্য অত্যন্ত যুগোপযোগী দিকনির্দেশনা প্রদান করছেন। তিনি খেলাফতের সাথে জামা'তের সদস্যদের দায়-দায়িত্ব কী? সে সম্পর্কে বার বার দিকনির্দেশনা প্রদান করে চলেছেন। খেলাফতের আসনে সমাসিন হয়ে সর্বপ্রথমে তিনি বলেন, **"কুদরতে সানিয়া অর্থাৎ খেলাফত খোদার পক্ষ থেকে অনেক বড় একটি পুরষ্কার, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐক্য সৃষ্টি করা এবং অনৈক্য থেকে সুরক্ষিত করা। এটি সেই মালা যাতে জামা'ত পুতির ন্যায় সাজানো রয়েছে। যদি পুতিগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে তাহলে সেগুলো যেমন সুরক্ষিত থাকে না তেমনই সুন্দরও দেখা যায় না। একই মালাতে গাঁথা পুতিগুলোই সুন্দর ও সুরক্ষিত থাকে। যদি দ্বিতীয় কুদরত না থাকত তাহলে ইসলাম কখনও উন্নতি করতে পারতো না। এই কুদরতের সাথে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা, ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখুন এবং খেলাফতের আনুগত্যকে নিজের জন্য স্থায়ী করে নিন। আর তার সাথে এমন ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী করে নিন যেন এর বিপরীতে সকল সম্পর্ক তুচ্ছ মনে হয়। ইমামের সাথে সম্পর্কের মাঝেই সকল বরকত নিহিত। আর তিনি আপনাদের জন্য সকল ধরনের ফিতনা ও পরীক্ষা থেকে রক্ষা করার জন্য ঢালস্বরূপ।"**

নেযামে খেলাফতের জন্য আমরা আল্লাহ্ তা'লার যতটাই শুকরিয়া আদায় করিনা কেন তা খুবই কম। আমরা যদি শুকরিয়া আদায় করতে করতে নিজেদের অস্তিত্বকে বিলিন করে দেই তবুও এর শুকরিয়া আদায় করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের প্রথম দায়িত্ব হল আমরা যেন এই নিয়ামতের মর্যাদাকে সঠিকভাবে অনুভব করে হৃদয়ের গভীর থেকে আল্লাহ্ তা'লার শুকরিয়া আদায় করতে থাকি এবং দোয়া করতে থাকি যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার তৌফিক দান করেন আর আমাদের শুকরিয়া গ্রহন করে নিজ ওয়াদা অনুযায়ী আমাদের উপর খেলাফতের ছায়া প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

যুগখলীফা প্রতিনিয়ত সমস্ত জামা'তের জন্য দোয়া করতে থাকেন। যদিও এর প্রতিদান কখনই দেয়া সম্ভব নয় কিন্তু প্রত্যেক নিষ্ঠাবান আহমদীর উপর এটা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যায়, সে যেন সর্বদা তার দয়াপরবশ নেতার জন্য দোয়া করতে থাকে। এতে দুর্বলতা প্রদর্শন করা একেবারেই উচিত নয়। প্রত্যেক মুমিনের মুখে اَللّٰهُمَّ اَيِّدْ اِمَامَنَا بِرُوْحِ لِلْقُدُسِ। অর্থাৎ **'হে আল্লাহ্! আমাদের ইমামকে পবিত্র আত্মা দ্বারা সাহায্য কর'** এই দোয়া করতে থাকা উচিত।

এতায়াত বা আনুগত্যের বিষয়ে একটি বিষয় মনে রাখা উচিত, কুরআন করীমের যে সূরায় **'আয়াতে ইস্তেখলাফ'** বর্ণিত হয়েছে

সেই সূরাতেই অর্থাৎ সূরা নূরের ৬৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এটিও বলেছেন, لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا অর্থাৎ **'তোমরা রসূলের আহবানকে তোমাদের একে অপরকে আহবানের ন্যায় মনে করো না।'**

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তার তফসীর গ্রন্থ তফসীরে কবীরে লিখেন, **"তোমাদের জন্য আবশ্যক যে, যখনই তোমাদের কানে খোদা তা'লার রসূলের আওয়াজ আসে, তোমরা তৎক্ষনাত তার উপর লাব্বাইক বল ও তার উপর আমলের জন্য তোমরা ঝাঁপিয়ে পর আর এতেই তোমাদের উন্নতির রহস্য নিহিত। যদি মানুষ সেই সময়ে নামাযে থাকে তাহলেও তার উপর আবশ্যক সে যেন নামায ভেঙ্গে খোদার রসূলের আহবানে সাড়া দেয়। এই আদেশ 'খলীফাতুর রসূল'-এর জন্যেও, আর খলীফার ডাকে সাঁড়া দিয়ে একত্রিত হওয়াও আবশ্যক।"** *(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা: ৪০৮-৪০৯)*

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর জ্ঞানগর্ভ জুমুআ'র খুতবা নিয়মিত শোনা ও পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শোনা, বাচ্চাদেরকে শোনানো ও বুঝিয়ে দেয়া প্রত্যেক আহমদীর মৌলিক দায়িত্ব। যেসকল আহমদী হুযুর (আই.)-এর প্রত্যেকটি খুতবা পূর্ণ মনযোগ দিয়ে শুনে না তারা হুযুরের কথার উপর আমলের সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত থাকে।

হযরত আমীরুল মুমিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) তাঁর জুমুআ'র খুতবায় ও বিভিন্ন বক্তৃতার মধ্যে নামায প্রতিষ্ঠা, দোয়া করা, নিজেদের ইবাদতের মান বাড়ানো ও বিভিন্ন তরবিয়তি বিষয়ের প্রতি বার বার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এই সবগুলো বিষয় আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যকীয়। প্রত্যেক নিষ্ঠাবান আহমদীর দায়িত্ব হচ্ছে আত্মবিশ্লেষণ করা যে, সে বিশ্বস্ততার সাথে এসব দায়িত্ব পালন করছে কি না। খেলাফতের প্রতি আমাদের ভালোবাসা আছে, এটি শুধু মুখে বললেই চলবে না বরং খলীফার কথামত চলে নিজের ভিতর পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করাই হল তার প্রকৃত প্রমাণ।

এরপর আরেকটি দায়িত্ব হল **'তবলীগ করা'**। আমাদের প্রিয় খলীফা বহুবার এ বিষয়টি স্মরণ করিয়েছেন। জামা'তের এমন অনেক বন্ধু আছেন যারা খলীফার মুখ থেকে কোন কথা বের হওয়া মাত্র তার উপর আমল করার জন্য উদগ্রীব হয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে প্রতি বছর অনেক তবলীগ হচ্ছে। কিন্তু এখন শতকোটি মানুষ এমন আছে যারা যুগের মাহদী সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত নয়। তাদের হৃদয়ে প্রকৃত ইসলামের বাণী ও যুগের মাহদীর আগমনবার্তা পৌঁছানো আমাদের কাজ।

আজ নানাভাবে আমাদের প্রিয় মনিব নবিকুল শিরোমণি, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পবিত্র জীবনীর উপর কালিমা লেপন করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। রসূলে আকরাম (সা.)-এর উপর উত্থাপিত বিভিন্ন আপত্তির খণ্ডন করা ও পৃথিবীকে তাঁর (সা.)-এর উত্তম আদর্শ সম্পর্কে জানানো আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব।

আরেকটি নেকী যার দিকে আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন তা হল, **'নেযামে ওসিয়্যত'**-এ শামিল হওয়া। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখন পর্যন্ত অনেক বুযুর্গান এই আহবানে সাঁড়া দিয়ে নিজেদের জীবনকে সৌভাগ্যমন্ডিত করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু এখনও এমন অনেকে আছেন যারা এই ডাকে সাঁড়া দিয়ে সৌভাগ্যবান হতে পারেন নি। এই তাহ্রীক কোন সাধারণ তাহ্রীক নয়। এটি সত্যিকার ও নিষ্ঠাবান আহমদীদেরকে পার্থক্য করার তাহ্রীক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভাষায়, আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা হল, **"এই ব্যবস্থাপনার দ্বারা মুনাফেক ও মুমিনদের মাঝে পার্থক্য করবেন।"** *(পুস্তক: আল ওসীয়্যত)*

ঐশী খেলাফতকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য মুমিনদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল, শুধু নিজেরাই নেযামে খেলাফতের সুরক্ষা ও স্থায়ীত্বের লক্ষ্যে সকল ক্ষেত্রে খেদমত করলে চলবে না বরং নিজেদের সন্তানদের মাঝেও এই প্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে। আজকের তরুনরাই আগামী দিনে জামা'তের নেতৃত্ব দানকারী। তাই তাদের হৃদয়ে ঐশী খেলাফতের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে খলীফার সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া আহমদী মা-বাবার অনেক বড় একটি দায়িত্ব।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে **'ঐশী খেলাফত'** কী তা সঠিকভাবে অনুধাবন করে আমাদের উপর যে দায়-দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করার সৌভাগ্য দান করুন (আমীন)।

# ধর্মে খেলাফতের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব

মাওলানা মোমেন হোসেন
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

অর্থ: **"এবং তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ো না এবং স্মরণ কর তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করলেন এবং তোমরা তাঁর নেয়ামতের ফলে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে, এবং তোমরা অগ্নিকুন্ডের কিনারায় ছিলে তখন তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করলেন। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা হেদায়াত পাও।"** *(সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৪)*

মহান আল্লাহ্ তা'লা তাঁর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা এবং মানুষ যাতে তাঁকে চিনতে পারে সেই নিমিত্তে পৃথিবীর সূচনা থেকে ধরাবাহিকভাবে মানবজাতির জন্য নবী রসূল প্রেরণ করেছেন। আর নবী রসূলগণ আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজ প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। তারা এসে মানবজাতীকে সত্যের পথ দেখিয়েছেন। মূলত তাদের ধর্ম ছিল আল্লাহ্‌র ধর্ম অর্থাৎ একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা। আর এমন কোন নবুয়্যত নেই যার পর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় নি। নবীর মৃত্যুর পর তার শিক্ষাকে বাস্তবায়নের লক্ষে নবীর অবর্তমানে যিনি তার স্থলে অভিষিক্ত হন তাকেই খলীফা বলা হয়। খলীফার কাজই হয় নবীর মৃত্যুর পর নবীর কাজকে জারি রাখা। আর তা দীর্ঘায়িত হয় ততদিন যতদিন সেই খেলাফতের সমাপ্তি না ঘটে। হাদীসে এসেছে: مَا كَانَتْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلَّا تَبِعَتْهَا خِلَافَةٌ অর্থাৎ **'পৃথিবীতে এমন কোন নবী আসেন নি যার ইন্তেকালের পর খেলাফত কায়েম হয় নি।'**

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, খেলাফত এতটাই আবশ্যক যে প্রত্যেক নবীর মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'লা খেলাফত কায়েম করেছেন। আর এ থেকে বুঝা যায় যে, নবীর মৃত্যুর পর নবীর কাজ সমাধা করার জন্য খেলাফতের গুরুত্ব অপরিসীম।

আমরা জানি পৃথিবীতে এক লক্ষ মতান্তরে দুই লক্ষ নবী রাসূল আগমন করেছেন। আর নবীর আগমনের উদ্দেশ্যই হল পৃথিবীতে খোদার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা। নবী ও রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেন এবং মানবজাতিকে সত্যের এবং হেদায়াতের পথ দেখান। আর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই কাজ করে যান। কিন্তু নবী যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন এক অন্ধকার নেমে আসে। ধর্মত্যাগের মত ঘটনা ঘটতে থাকে। এমন অন্ধকার পরিস্থিতিতে নবীর মৃত্যুর পর তাঁর উম্মতকে তার স্থলাভিষিক্তি খলীফাই নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। আর যদি নবীর মৃত্যুর পর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে নবী যে ধর্ম আনয়ন করেছেন তা বিলুপ্ত হতে শুরু করে এবং এক পর্যায়ে তা ধ্বংস হয়ে যায়। আর যতদিন খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকে ততদিন পৃথিবীতে নবীর কাজ জারি থাকে। আর যখনই সেই খেলাফত শেষ হয়ে যায় তখন নবীর আনিত সেই ধর্ম শুধু নামেই পরে থাকে। নবীর আদর্শ আর অবশিষ্ট থাকে না।

আরেকটি বিষয় হল যখন নবীর মৃত্যু হয় তখনও অনেক ভবিষ্যদ্বাণী অপূর্ণ থেকে যায়। নবীর আগমনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য তখনও পুরোপুরি অর্জিত হয় না। আর তা অর্জিত না হলে নবীর আগমনের উদ্দেশ্য সফল হবে না। তাই নবীর ইন্তেকালের পর পর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জামা'তের মধ্যে একজনকে খলীফা মনোনিত করেন এবং খলীফার হাত ধরেই নবীর অপূর্ণ কাজ সমাধা হয়। নবীর সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি নবীর ইন্তেকালের পর খেলাফত কায়েম হওয়ার বিধান না থাকত তাহলে কী হত? নবীর মৃত্যুর পর পরই যদি খেলাফত কায়েম না হত তাহলে নবীর জামা'ত ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। শুধু তাই নয়, যারা সারা জীবন নবীকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়েছে, বিরোধীতা করেছে তারাই বিজয়ী হত আর নবীর জামা'ত নেতৃত্বের অভাবে দুর্বল হয়ে যেত। তাই যদি নবীর মৃত্যুর পর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত না হত তাহলে বিরুদ্ধবাদীরা আরও সুযোগ পেত বিরোধীতা করার এবং হাসি তামাশা করার। তখন নবীর মান্যকারীরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যেত। এটা স্বাভাবিক যে যখন কোন পরিবারের পিতা

মাতা মারা যায় আর সন্তানদের জন্য কোন অভিভাবক না থাকে তখন তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় সেই পরিবারের অস্তিত্বই থাকে না । তেমনি যখন নবীর মৃত্যুর পর খলীফারূপে কোন অভিভাবক না থাকে তখন নবীর জামা'তও বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে তা শুধু নামে মাত্রই বিদ্যমান থাকে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, **"সুফীয়ায়ে কেরাম লিখেছেন, যখন কোন রসূল বা বুযুর্গ মারা যান তখন পৃথিবীর অবস্থা এমন হয় যেমন ভূমিকম্প এসে গেলে হয়, সে এক বিপজ্জনক অবস্থা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কোন একজন খলীফার মাধ্যমে ঐ অবস্থাকে দূর করে দেন। খলীফা এসে সম্পূর্ণ পরিস্থিতিকে পুনরায় নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসেন, সংস্কার করেন, সুশৃংখল করেন।"** (মলফুযাত : ৫ম খণ্ড, পৃ: ৫২৫)

হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম খুতবায় বলেছিলেন, **"আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তোমাদের উপরে খলীফা নিযুক্ত করেছেন যেন এর দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং তোমাদের একতাকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করেন।"**

অতএব একথা স্পষ্ট যে, জামা'ত হোক বা জাতীয় জীবন হোক এক নেতা বা ইমাম বা খলীফা আবশ্যক নতুবা সেই জামা'ত সুসংহত এবং দীর্ঘস্থায়ী থাকে না।

আবার উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, **"তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ো না এবং স্বরণ কর তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করলেন এবং তোমরা তাঁর নেয়ামতের ফলে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে, এবং তোমরা অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় ছিলে তখন তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করলেন।"**

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লার রজ্জুকে আঁকড়ে ধরার কথা বলা হয়েছে। এই রজ্জু হল **'খেলাফত'**। এই খেলাফতই হল সেই নেয়ামত যার মাধ্যমে মানুষ বিভক্ত হয় না এবং নবীর মৃত্যুর পর যখন চারিদিকে অন্ধকার ছেয়ে যায় তখনই আল্লাহ্‌র এই রজ্জু অর্থাৎ খেলাফত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মু'মিনগণ পূর্বের ন্যায় আবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং ধর্মে খেলাফতের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। খেলাফত না থাকলে ধর্ম মৃত আর খেলাফত থাকলে সে ধর্ম জীবিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে খেলাফতের গুরুত্ব অনুধাবণ করার তৌফিক দান করুন এবং সেই সাথে এই নেয়ামতের যথাযথ মুল্যায়ণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

"ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ্ খিলাফতে আহমদীয়া আর কখনো কোন শঙ্কা বা সংকটের সম্মুখীন হবে না। জামাত তার যৌবনে উপনীত হয়েছে। কোন অমঙ্গলকামী ব্যক্তি এখন আর খিলাফতের লেশমাত্র ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আর এমনি ধারায় মহা সমারোহে জামাত উন্নতি করে যাবে।"

*[হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ আর-রাবে (রাহে), খুতবা জুমুআ ১৮-০৬-১৯৮২ খ্রি.]*

# আহমদীয়া জামা'তের খলীফাগণের দোয়া গৃহীত হওয়ার কিছু ঘটনা

মাওলানা মুহাম্মদ আল হক
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আল্লাহ তা'লার চিরন্তন রীতি তিনি তার বান্দার দোয়া গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে থাকেন। আর তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূল, তাঁর মনোনীত ব্যক্তি, মোমেন-মুত্তাকী এবং যারা তাঁর অধিক নিকটবর্তী তাদের দোয়া অধিক শ্রবণ করেন। পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

অনুবাদঃ **"এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বল) 'আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে, যাতে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।"** *(সূরা আল বাকারা, আয়াত: ১৮৭)*

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বলেন,

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: یَنْزِلُ رَبُّنَا کُلَّ لَیْلَةٍ اِلَی السَّمَآءِ الدُّنْیَا حَتّٰی یَبْقٰی ثُلُثُ اللَّیْلِ الْاٰخِرُ فَیَقُوْلُ: مَنْ یَّدْعُوْنِیْ فَأَسْتَجِیْبَ لَهٗ مَنْ یَّسْاَلُنِیْ فَاُعْطِیَهٗ وَمَنْ یَّسْتَغْفِرُنِیْ فَاَغْفِرَلَهٗ۔

অনুবাদঃ **"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন, আমাদের প্রভু-প্রতিপালক প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন ঘোষনা করতে থাকেন- কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন, যে আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।"** *(তিরমিযী, কিতাবুত দাওয়াত)*

অপর এক হাদীসে হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **"আল্লাহ্ তা'লা অত্যাধিক লজ্জাশীল ও দয়ালু। যখন কোন ব্যক্তি তার দরবারে তার দুই হাত তুলে (প্রার্থনা করে) তখন তিনি তার দু'হাত শূন্য ও বঞ্চিত অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন।"** *(তিরমিযী কিতাবুত দাওয়াত)*

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) দোয়া গৃহীত হওয়া সম্পর্কে বলেন, **"যেন স্মরণ থাকে যে, খোদা তা'লার নিকট বান্দার গ্রহণযোগ্যতা জানার জন্য দোয়া গৃহীত হওয়াও একটি বড় নিদর্শন। বরং দোয়া গৃহীত হওয়ার মত আর কোন নিদর্শন নেই। কারণ দোয়ার গ্রহণযোগ্যতার মাধ্যমেই সাব্যস্ত হয় যে, একজন দাসের ঐশী দরবারে সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। যদিও দোয়া গৃহীত হওয়া সর্বস্থানে আবশ্যক বিষয় নয়। কখনো কখনো মহা সম্মানিত খোদা নিজ ইচ্ছাও অবলম্বন করেন। কিন্তু এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, গ্রহণযোগ্যদের সম্মানের খাতিরে এটিও একটি নিদর্শন যে, অন্যদের তুলনায় তার দোয়া অধিক গৃহীত হয়। আর দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়ে কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না।"** *(হাক্বীক্বাতুল ওহী, রুহানী খাযায়েন ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৩৪)*

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী আল মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, **"আল্লাহ্ তা'লা যাকে খেলাফতের আসনে সমাসীন করেন তাঁর দোয়ার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে দেন। কারণ যদি তার দোয়া গৃহীত না হয় তাহলে তার নির্বাচনের অবমাননা হয়। তোমরা আমার জন্য দোয়া কর যেন আমি তোমাদের জন্য অধিক দোয়া করার সামর্থ লাভ করি। আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সর্বপ্রকার অলসতা দূর করে উদ্দমতা দান করুন। আমি যে দোয়া করব তা ইনশাআল্লাহ্ অন্যান্য সকল ব্যক্তির দোয়ার তুলনায় অধিক শক্তি রাখবে।"** *(মানসাবে খেলাফত, আনোয়ারুল উলূম ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৭)*

বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর দোয়া গৃহীত হওয়ার হাজার হাজার নিদর্শন রয়েছে এবং তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর খলীফাগণেরও

দোয়া গৃহীত হওয়ার অগণিত নিদর্শন রয়েছে। যদ্বারা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং আহমদীয়া খেলাফত যে ঐশী খেলাফত সেটিও সাব্যস্ত হয়। নিম্নে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হলঃ

## হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর দোয়া গৃহীত হওয়ার ঘটনাবলী

**শ্রদ্ধেয় শেখ আব্দুল লতিফ সাহেব বাটালবী বলেন,** "একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর নিকট মৌলভী গোলাম মুহাম্মদ সাহেব অমৃতসরী উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, দারুয যু'য়াফায় অবস্থানকারী ও বিদ্যালয়ের দরিদ্র শিক্ষার্থীগণ যারা সম্ভবত মালাবার থেকে এসেছিলেন, তাদের কাছে ঠান্ডা থেকে বাঁচার কোন বস্ত্র নেই। হুযুর হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) বললেন, আমরা এখন দোয়া করি। অতএব তিনি দোয়া করা আরম্ভ করলেন। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিন ইতালী থেকে উন্নত মানের কম্বল আসা শুরু হল। আর যখনই আসতো তিনি (রা.) সাথে সাথে বিতরণ করতেন। যখন নবম অথবা এগারতম কম্বল আসলো তাঁর সহধর্মীণি মোহতরমা হযরত আম্মাজানের এই কম্বল খুবই পছন্দ হল। তিনি নিবেদন করলেন, এই কম্বল তো আমি দিব না। হুযুর (রা.) মুচকি হেসে বললেন, আজ একুশটি কম্বল আসার ছিল কিন্তু এখন আর আসবে না। সুতরাং এরপর আর কোন কম্বল আসে নি।" *(হায়াতে নূর, পৃষ্ঠা-৫১৭)*

**শ্রদ্ধেয় চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ সাহেব বি.এ বর্ণনা করেন,** "১৯০৯ সালে বর্ষাকালে একবার লাগাতার আট দিন বৃষ্টি হতে থাকে। যার ফলে কাদিয়ানের অনেক বাড়ি ধ্বসে পড়ে। প্রয়াত হযরত নওয়াব মুহাম্মদ খান সাহেব কাদিয়ানের বাহিরে নতুন কুঠি নির্মাণ করেছিলেন সেটিও ভেঙ্গে পড়ে। অষ্টম অথবা নবম দিনে হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) যোহরের নামাযের পর বললেন, আমি দোয়া করছি আপনারা সবাই আমীন বলুন। দোয়া করার পর তিনি (রা.) বললেন, আমি আজ সেই দোয়া করেছি যা হযরত মুহাম্মদ (সা.) সারা জীবনে একবার করেছিলেন। দোয়া করার সময় মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। এরপর বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। আর আসরের সময় আকাশ পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে গেল এবং রোদ বের হয়েছিল।" *(হায়াতে নূর, পৃষ্ঠা: ৪৪১-৪৪২)*

## হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর দোয়া গৃহীত হওয়ার ঘটনাবলী

**মোহতরমা সাদিয়া খানম লিখেন,** "আমার ছেলে জন্ম থেকেই অসুস্থ ও দূর্বল ছিল। এটা ১৯৫৫ সালের কথা। যখন তার বয়স কেবল ২০ দিন তখন তার নিউমোনিয়া হয়। অতঃপর এক দেড় বছরের মধ্যে চার বার লাগাতার এই রোগের আক্রমণ হয়। চিকিৎসার কোন কমতি ছিল না। কিন্তু সর্বদা তার অসুস্থতার দুঃচিন্তা লেগে থাকতো। একদিন আসরের সময় যখন হুযুর (রা.)-এর নামাযে আগমনের সময় ছিল; আমার স্বামী বাচ্চাটিকে নিয়ে গেলেন। হুযুর (রা.) **'কাসরে খেলাফত'** থেকে বাহিরে আসলেন, তখন আমার স্বামী সামনে অগ্রসর হয়ে নিবেদন করলেন, হুযুর দোয়া করে দিন। হুযুর (রা.) স্নেহভরে শিশুটির কোমরে হাত বুলালেন এবং দোয়া করলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে শিশুটি সেই কষ্টদায়ক রোগ থেকে সুস্থ্য হয়ে যায়। আর আজ পর্যন্ত এর পুনরায় আক্রমণ হতে সুরক্ষিত আছে আলহামদুলিল্লাহ।" *(মাসিক মিসবাহ, সেপ্টেম্বর ১৯৬২ খ্রি.)*

**জনাব মালিক হাবিবুল্লাহ সাহেব,** বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত উপ-পরিদর্শক বলেন, "শুজা'আবাদ প্রতিষ্ঠার সময় আমার এমন একটি রোগ হয় যেটি আমাকে একেবারে নিস্তেজ ও মৃতের মত করে দেয়। কয়েক দিন পর পরই পেটে এমন তীব্র ব্যথা হত যার ফলে আমি বেহুশ হয়ে যেতাম। প্রায় দু'বছর আমি সব ধরণের চিকিৎসা করি। কিন্তু অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। অবশেষে অতিষ্ট হয়ে অমৃতসরের সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হই। সেখানে পরীক্ষা করানো হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, আমার পিত্তথলি ও এপেন্ডিক্স উভয়ের অপারেশন করতে হবে। এতে আমার মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং আমি একদিন অনুমতি ছাড়াই হাসপাতাল থেকে চলে যাই। অতঃপর কাদিয়ান পৌঁছি এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করি। হুযুর (রা.) মনোযোগ সহকারে শুনে বললেন, আপনার এপেন্ডিসাইটের সমস্যা তো একেবারেই নেই। হ্যাঁ পিত্তের মধ্যে সমস্যা রয়েছে। আপনি চিকিৎসা করান। আমি দোয়া করবো; ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আরাম হবে। এরপর আমার বিশ্বাস সৃষ্টি হল যে, আমি সুস্থ্য হব। অতঃপর আমি আমার কর্মস্থলে চলে আসলাম এবং মুলতানের একজন সাধারণ হাকিমের কাছ থেকে ঔষধ নিয়ে সেবন করা আরম্ভ করলাম। তিন চার মাস পর রোগের কোন চিহ্নও রইলো না। অথচ এর পূর্বে প্রায় দু'বছর ইউনানী ও বিলেতী ঔষধ ব্যবহার/সেবন করেছিলাম। এটা কেবল হুযুর (রা.)-এর অলৌকিক দোয়ার

ফল ছিল। যার ফলে আমার মত জটিল রোগী সুস্থ্য হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এরপর আজ পর্যন্ত আর আমার পেটে ব্যথা হয়নি। অথচ খাবারের বিষয়ে অনেক অনিয়ম করেছি।" ( দৈনিক আল ফযল, ২০ মার্চ ১৯৬৬ খ্রি.)

## হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-এর দোয়া গৃহীত হওয়ার ঘটনাবলী

**মোকাররম মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব লিখেন,** ১৯৬৫ সালে যখন খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) খেলাফতের মসনদে সমাসীন হন; খাকসার ঐ সময়ে মনডি বাহাউদ্দিনে মুরুব্বি হিসেবে নিযুক্ত ছিলাম। একবার আমার পেটের ডান পাশে ব্যথা অনুভূত হতে লাগলো। একজন চিকিৎসকের নিকট পরামর্শের জন্য যাই। ডাক্তার সাহেব ভালোভাবে পরীক্ষা করার পর পুনরায় আসার জন্য বললেন। যখন পুনরায় উপস্থিত হলাম সেখানে আরো একজন ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করার জন্য উপস্থিত ছিলেন। অতএব এবার উভয় ডাক্তার মিলে পরীক্ষা করার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, এপেন্ডিক্স বৃদ্ধির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আর এ অবস্থায় অপারেশনের প্রয়োজন হবে। খাকসার এটি শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম এবং পরদিনই খাকসার রাবওয়া পৌঁছে হুযুর (রাহে.)-এর সমীপে উপস্থিত হই। সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে ডাক্তারদের মতামত ব্যক্ত করে দোয়ার বিনীত নিবেদন করি। হুযুর (রাহে.) গভীর মনোযোগের সাথে সমস্ত কথা শুনে খাকসারকে শান্তনা দিলেন যে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আমি দোয়া করবো। আর ডাক্তারদের মতামত অনুযায়ী এপেন্ডিক্স-এর কষ্ট কখনো থাকবে না। আপনি চিন্তা করবেন না। অতএব খাকসারের সব চিন্তা দূর হতে লাগল বরং যদি কোন কষ্ট পর্দার আড়ালে থেকেও থাকতো আমার প্রিয় মনিবের দোয়ার বদৌলতে আল্লাহ্ তা'লা ফযল করেন এবং ডাক্তারদের অভিমতের বিপরীত হয়। আলহামদুলিল্লাহ আ'লা যালেক।" *(মাসিক খালেদ, সৈয়্যদনা নাসের সংখ্যা, পৃষ্ঠা: ২৩৭-২৩৮, এপ্রিল-মে ১৯৮৩ খ্রি.)*

**চৌধুরী মুহাম্মদ সাঈদ কলিম,** দারুল উলুম ঘারবি রাবওয়া লিখেন, "আমার পুত্রবধু বর্তমানে জার্মানীতে আছেন। তার পেটে ব্যথা হত। সেখানকার ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন যে, অপারেশন করুন। আমি এই চিঠি হুযুর আনোয়ার (রাহে.)-এর নিকট উপস্থাপন করলাম। এবং নিবেদন করলাম হুযুর! দোয়া করুন যেন আমার পুত্রবধু অপারেশন ছাড়াই সুস্থ্য হয়। সুতরাং তিনি (রাহে.) বললেন, "তাকে লিখে দাও যেন অপারেশন না করায়। আমি দোয়া করবো, সে সুস্থ্য হয়ে যাবে।" অতএব আমি হুযুর (রাহে.)-এর বাক্যাবলি তাকে লিখে পাঠালাম। আর সে অপারেশন ছাড়াই সুস্থ্য হয়ে যায় এবং এখন পর্যন্ত সুস্থ্য আছে, আলহামদুলিল্লাহ।" *(মাসিক খালেদ, সৈয়্যদনা নাসের সংখ্যা, পৃষ্ঠা: ২৯১ মে ১৯৮৩ খ্রি.)*

## হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর দোয়া গৃহীত হওয়ার ঘটনাবলী

**ডাক্তার সৈয়দ বরকত আহমদ সাহেব** ইন্ডিয়ান ফরেইন সার্ভিসে কর্মরত ছিলেন; কয়েকটি পুস্তক রচনা করেছেন। হুযুর আনোয়ার হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর পুস্তক 'মাযহাব কে নাম পার খুন' (ধর্মের নামে রক্তপাত)-এর ইংরেজি অনুবাদ করেন। তিনি মুত্রাশয়ের ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। আমেরিকাতে যার আট ঘন্টার বিফল অপারেশন হয় এবং ডাক্তাররা চার থেকে ছয় সপ্তাহের আয়ুর কথা বলেন। হুযুর আনোয়ার (রাহে.)-এর নিকট দোয়ার নিবেদন করেন। উত্তর আসে, **"দোয়ার প্রার্থনা সম্বলিত আপনার দুঃখ ভারাক্রান্ত চিঠিটি অনেক প্রভাব সৃষ্টি করেছে; আমার আপনার জন্য অত্যন্ত বিনয়চিত্তে দোয়া করার সৌভাগ্য হয়েছে। এ দোয়ার সময় এমন একটি মুহূর্ত আসে যে, আমার শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়, আমি ঐশী অনুগ্রহের অপেক্ষায় আছি যে, এটি কবুলিয়্যতের নিদর্শন ছিল।"** অতএব হুযুরের দোয়ার কবুলিয়্যতের ফলে খোদা তা'লার অনুগ্রহে তিনি চার বছর পর্যন্ত কর্মময় একাডেমিক ও গবেষণালব্ধ জীবন অতিবাহিত করেন। ডাক্তার তার জীবন এবং কর্মময় একাডেমিক ও গবেষণালব্ধ জীবনে বিস্মিত ছিলেন। বরকত সাহেব বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের আধ্যাত্মিক নেতার দোয়া শ্রবণ করেছেন। তখন ডাক্তার মাথা নেড়ে বলেন, হ্যাঁ এটি মো'জেযা, মো'জেযা (অলৌকিক নিদর্শন)। *(আল ফযল, ৯ ডিসেম্বর ২০০০ খ্রি.)*

হুযুর আনোয়ার (রাহে.) ২৫ জুলাই ১৯৮৬ সালে প্রদত্ত জুমু'আর খুতবায় নিম্নলিখিত দোয়া গৃহীত হওয়ার ঘটনাটি শুনান, "নাইজেরিয়া থেকে **সাইফুল্লাহ চিমা সাহেব লিখেন,** গতবার আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসি আমার সাথে আমার সহধর্মিনীও ছিল। আমরা উল্লেখ করি যে, আমাদের বিয়ের একটি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু কোন সন্তান-সন্ততি নাই। সে সময় আপনি অবলিলায় এ বাক্য বলেন, **"বুশরা বেটি! পরবর্তিতে যখন আসবে তখন পুত্র নিয়ে আসবে।"** চিমা সাহেব লিখেন, আলহামদুলিল্লাহ, আপনাকে এ সুসংবাদ দিচ্ছি যে, এরপর যখন আমরা

আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসবো পুত্র নিয়ে আসবো। কেননা আল্লাহ্ তা'লা সেই পুত্র দান করেছেন।" *(পরিশিষ্ট মাসিক খালেদ, রাবওয়া, জুলাই ১৯৮৭ খ্রি.)*

## হযরত খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আই.)-এর দোয়া গৃহীত হওয়ার ঘটনাবলী

**আইভরিকোস্ট-এর এক নবীন পাইলট** এক বছরের কোর্স করার জন্য বেলজিয়াম এসেছিল। এখানে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করে। সে বলেছে, তাকে যে পাইলট হওয়ার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে তা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর দোয়ার ফল।

ঘটনা এমন, কয়েক বছর পূর্বে যখন সে আইভরিকোস্টের বার্ষিক জলসায় যোগদান করে সেখানে তার বন্ধু তাকে বলে, আমি একটি বিজ্ঞাপন দেখেছি, আইভরিকোস্ট লোকদেরকে তাদের সার্ভিসে নেয়ার জন্য প্রতিযোগীতা করাচ্ছে। কিন্তু ফাইল জমা করানোর সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। সে বর্ণনা করেছে যে, সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল এতদসত্ত্বেও আমি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর খেদমতে দোয়ার জন্য লিখি এবং সাথেই নিজ ফাইল জমা করাই। কয়েক দিন পর সে উত্তর পায়, যদিও আপনি দেরিতে ফাইল জমা করিয়েছেন কিন্তু আমরা আপনাকে অনুমতি দিচ্ছি যে, আপনি এই প্রতিযোগীতায় অংশ নিন। অতঃপর সে সেই প্রতিযোগীতার জন্য লিখিত পরীক্ষা দেয় এবং এক হাজার প্রার্থীর মধ্যে শুধুমাত্র পনের জন প্রার্থী নির্বাচিত হয়; যাদের মধ্যে তার নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে বলে, এসব কিছু হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর দোয়ার ফলেই হয়েছে। (আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ২৫ অক্টোবর ২০১৯ ইং)

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ২০১৯ সালের জার্মানী সফরের রিপোর্টে লিপিবদ্ধ আছে। **মায়োট আইল্যান্ড** (Mayotte Island) থেকে আগত এক ব্যক্তি **ইউসুফ সাহেব** হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন। মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব লিখেছেন, তার অর্থাৎ ইউসুফ লাবিউন সাহেবের পিতা তাকে কাফের বলে এবং তার অনেক বিরোধীতা করে। এতে হুযুর আনোয়ার (আই.) তাকে উপদেশ প্রদান করেন যে, আপনি আপনার পিতার জন্য দোয়া করুন যেন খোদা তা'লা তাকে হেদায়েত দান করেন। তিনি নিবেদন করেন, তার সন্তানের যখন জন্ম হয়েছিল তখন ডাক্তারগণ বলেছিল, বাচ্চা প্রতিবন্ধী। এই শিশু ভবিষ্যতে বসতেও পারবে না, দাঁড়াতেও পারবে না আর দেখতেও পারবে না। তারা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর খেদমতে দোয়ার উদ্দেশ্যে পত্র লিখেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অলৌকিকভাবে শিশুর বিকাশ হয়। আর সেই শিশু এখন বসতেও পারে এবং দাঁড়াতেও পারে। হুযুর আনোয়ার (আই.) সেই শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'লা ফযল করবেন। ইউসুফ লাবিউন সাহেব সাক্ষাতের পর বলেন, যদিও শিশু বসতেও পারতো, দাঁড়াতেও পারতো কিন্তু তার চোখ ট্যাঁরা ছিল। কিন্তু সাক্ষাতের পর হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বরকতময় হাত বুলানোর পর আল্লাহ্ তা'লা অলৌকিকভাবে তার চোখও ঠিক করে দেন এবং তার চোখের ট্যাঁরাভাব দূর করে দেন। আলহামদুলিল্লাহ। *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ২৩ জুলাই, ২০১৯ইং)*

সারকথা হল, আল্লাহ্ তা'লা এখন দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শন যুগ খলীফার সাথে বিশেষভাবে জুড়ে দিয়েছেন। যেমনটি হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেছিলেন, খলীফার সত্তা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে কোন বাঁধা নয় বরং সহায়ক। এজন্য আমাদের যুগ খলীফার সাথে নিজ সম্পর্কের গভীরতা যাচাই করা উচিত। আর যেরকম নিষ্ঠা, ভালোবাসা ও আনুগত্য আমাদের মাঝে থাকবে আমরা অনুরূপ দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শন দেখব, ইনশাআল্লাহ্।

যুগ খলীফার সাথে জামা'তের সদস্যদের ভালোবাসা কত গভীর হয়ে থাকে তার একটি উদাহরণ দিয়েই আমি আমার লেখা শেষ করবো, "কয়েক বছর পূর্বে আরবের একটি দেশে পুলিশ একজন নতুন বয়াতকারীকে আহমদী হওয়ার কারণে গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দি করে। তার মুক্তির কোন উপায় দেখা যাচ্ছিল না। তার জন্য হুযুরের নিকট দোয়ার আবেদন জানানো হয়। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর দোয়ার ফলে তার অলৌকিক মুক্তি হয়। কিন্তু হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাথে তার ভালোবাসার অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি কারাগার থেকে হুযুরকে চিঠি লিখেন, আমার দেশে ৯ টি বড় বড় পাহাড় আছে আর আমি হলাম দশম পাহাড়। পৃথিবীর কোন শক্তি আমাকে আহমদীয়াত থেকে সরাতে পারবে না, আপনার প্রতি আমার ভালোবাসাও কেউ কমাতে পারবে না।"

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে খেলাফতের সাথে ঠিক এমনভাবেই জুড়ে দিন, যদি আমাদের শরীর থেকে চামড়া তুলে নেয়া হয় এবং আমাদের সম্পদ ও ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হয় তবুও আমরা খেলাফতের আঁচলকে ছাড়ব না ইনশাআল্লাহ্ (আমীন)।

# খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ

**সোলায়মান আহমদ**
**ছাত্রঃ ২য় বর্ষ, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ**

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন করীমে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুসংবাদ দিতে গিয়ে বলেন-

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡکُمۡ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِی الۡاَرۡضِ کَمَا اسۡتَخۡلَفَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ۪ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمۡ دِیۡنَهُمُ الَّذِی ارۡتَضٰی لَهُمۡ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ اَمۡنًا ؕ یَعۡبُدُوۡنَنِیۡ لَا یُشۡرِکُوۡنَ بِیۡ شَیۡئًا ؕ وَمَنۡ کَفَرَ بَعۡدَ ذٰلِکَ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ ﴿۵۶﴾

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেরূপে তিনি তাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন এবং নিশ্চয় তিনি তাদের সেই দ্বীনকে সুদৃঢ় করবেন যাকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং নিশ্চয় তিনি তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর তাকে তাদের জন্য শান্তিতে পরিবর্তন করে দিবেন; তারা আমার ইবাদত করবে এবং কোন কিছুকে আমার সাথে শরীক করবে না; এরপর যারা অস্বীকার করবে তারা দুষ্কৃতিপরায়ণ বলে সাব্যস্ত হবে। *(সূরা নূর, আয়াত-৫৬)*

আল্লাহ্ তা'লার চিরন্তন রীতি বা সুন্নত এটিই যে, জগতে যখনই অমানিশা এবং পথভ্রষ্টতার পালা আসে এবং সৃষ্টিকুল যখনই মহান স্রষ্টা হতে মুখ ফিরিয়ে মিথ্যার জালে জড়িয়ে পড়ে তখন খোদা তা'লা তাদের সুপথে পরিচালিত করার জন্য নবী-রসূল প্রেরণ করেন। কিন্তু নিয়তির অমোঘ বিধান অনুসারে কিছু কাজ অবশিষ্ট রেখেই নবী-রসূলগণ এই ধরাধাম ত্যাগ করেন। তখন আল্লাহ্ তা'লা আপন **'কুদরতে সানীয়া'** অর্থাৎ খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। আদিকাল থেকে এটিই খোদা তা'লার ঐশী রীতি। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেন,

مَا كَانَتْ نُبُوَّةٌ قَطُّ اِلَّا تَبِعَتْهَا خِلَافَةٌ

অর্থাৎ, **"প্রত্যেক নবুয়্যতের পর অবশ্যই খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"** *(কানযুল উম্মাল)*

পূর্ববর্তী নবীর উম্মতের মাঝে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঠিক একইভাবে নবী করীম (সা.)-এর ওফাতের পরও খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও শেষ যামানায় পুনরায় নবুয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুসংবাদ দিয়ে গেছেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। রসূলে করীম (সা.) বলেছেন,

ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةٌ عَلٰى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ (مسند احمد- بيهقى- مشكوة)

অর্থাৎ **"তখন নবুয়্যতের পদ্ধতিতে পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। মহানবী (সা.) এরপর নীরব হয়ে যান।"**

এই নীরবতার অর্থ হল এই খেলাফত ব্যবস্থা কেয়ামতকাল অবধি প্রতিষ্ঠিত থাকবে। খলীফা হচ্ছেন তিনি যিনি নবীর অন্তর্ধানের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন অর্থাৎ নবীর মৃত্যুর পর তাঁর মিশনকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে তিনি কাজ করে থাকেন। মূলত বিজয়ের সূচনা করেন নবী এবং তা পুরোপুরি অর্জিত হয় খেলাফতের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, **"খলীফার অর্থ স্থলাভিষিক্ত, যিনি ধর্মের সংস্কার করেন। নবীদের যুগ অবসানে যে অন্ধকার অমানিশা ছেয়ে যায়, তিনি তা দূরীভূত করেন। যিনি নবীর স্থলে নিযুক্ত হন তাকে খলীফা বলা হয়।"** *(মালফুযাত)*

মূলতঃ খেলাফতের গুরুত্ব সীমাহিন। খেলাফত ছাড়া মুসলিম জাতির একতা এক মুহূর্তও টিকে থাকতে পারে না। কেননা খলীফা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা নিযুক্ত করেন। **আয়াতে ইস্তেখলাফ** অর্থাৎ সূরা নূরের ৫৬ নম্বর আয়াতের প্রতি মনোনিবেশ করলে খলীফার প্রতি ঐশী সমর্থনের বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট হয়ে যায়। এই একটি আয়াতে তিন বার **'লামে তাকীদ'** এবং তিন বার **'নূনে সাকিলা'** ব্যবহৃত হয়েছে যে অক্ষরগুলো আরবী ভাষায় গুরুত্ব ও অবশ্যম্ভাবিতার জন্য

ব্যবহৃত হয়। আর এই আয়াতে বাবে ইস্তেফআলের ব্যবহার একটি গভীর অর্থ বহন করে।

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ- এর মাঝে এই চিরন্তন সত্য বর্ণিত হয়েছে যে, খোদা তা'লাই খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। খোদা তা'লা স্বীয় মহাশক্তি দ্বারা খলীফা বানান। খেলাফত প্রতিষ্ঠার পেছনে প্রকৃতপক্ষে মহা পরাক্রমশালী খোদার সুদৃঢ় হাত কার্যকর থাকে। এই বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেছেন– وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ অর্থাৎ সকল প্রকার কুদরত এবং শক্তির আধার খোদা খেলাফতের মাধ্যমে স্বীয় মনোনীত ধর্মকে শ্রেষ্ঠত্ব, ঐশ্বর্য্য, প্রতাপ, সম্মান এবং শক্তি প্রদান করেন। খোদা তা'লা আপন নিত্য নতুন শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের দৃঢ়তা এবং উন্নতির জীবন্ত নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন।

পবিত্র কুরআনের আয়াতে ইস্তেখলাফে আল্লাহ্ তা'লা খেলাফতের অফুরন্ত নেয়ামত এবং এর অশেষ কল্যাণের কথা বর্ণনা করেছেন। সত্যি কথা বলতে 'নেযামে খেলাফত' উম্মতে মুসলেমার অস্তিত্ব, উন্নতি, দৃঢ়তা এবং অগ্রগতির নিশ্চয়তা প্রদান করে। খোদার পক্ষ হতে এই পুরস্কার হচ্ছে 'হাবলুল্লাহ্' বা 'আল্লাহ্র রজ্জু'। এই রজ্জু খোদা তা'লার পক্ষ থেকে মু'মিন বা বিশ্বাসীদের জামা'ত লাভ করে থাকে এবং এর আনুগত্য করে তারা সফলতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। এই আশীষপূর্ণ ঐশী ব্যবস্থাপনার নেতৃত্বের সাথে যুক্ত থাকার ফলে মু'মিনদের জামা'ত প্রতি পদক্ষেপে ঐশী সাহায্য ও সমর্থন লাভ করে। আর এ রহমতের ছায়া সর্বদা তাদের মাথায় থাকে। এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন- "আজ ইসলামের উন্নতি আল্লাহ্ তা'লা আমার হাতে দিয়ে রেখেছেন, যেমন তিনি যুগে যুগে খলীফার হাতে দিয়ে থাকেন। অতএব যে আমার কথা শুনবে সে বিজয়ী হবে, যে আমার কথা শুনবে না সে পরাজিত হবে। যে আমার পিছনে চলবে তার জন্য আল্লাহ্র রহমতের দরজা খুলে যাবে। যে আমার পথ থেকে সরে যাবে তার জন্য আল্লাহ্র রহমতের দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে।..... আমার জন্য খোদা তা'লার তাঁজা নিদর্শনসমূহ এবং তাঁর জ্বলন্ত মোজেযাসমূহ এ কথার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট যে, খোদা আমাকে খলীফা নির্বাচন করেছেন।..... মোটকথা এটি ঐশী সিদ্ধান্ত যে, আমার জীবনে কোন মানবীয় শক্তি এ জামা'তের অগ্রযাত্রাকে বাঁধা দিতে পারবে না।"

মুহাম্মদী মসীহ্র তিরোধানের পর আল্লাহ্ তা'লা জামা'তে আহমদীয়াকে 'খেলাফাতুন আলা মিনহাজিন্ নবুয়্যাত'-এর মহান নেয়ামতে ভূষিত করেছেন এবং জামা'তে আহমদীয়া একের পর এক করে বর্তমানে খেলাফতের পঞ্চম মুকুটের অধিকারী। হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর মহা কল্যাণময় নেতৃত্বে এ জামা'ত ধারাবাহিকভাবে ক্রমাগত উন্নতি করে যাচ্ছে। আজ প্রতিটি দিন আহমদীয়া জামা'তের জন্য বিজয়ের সূর্য নিয়ে উদিত হচ্ছে। কাজেই আমাদের ঈমান হল ইসলামের বিশ্ববিজয় এবং জামা'তে আহমদীয়ার সমস্ত উন্নতি খেলাফতে আহমদীয়ার সাথেই সম্পৃক্ত। মহান আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়া খেলাফতকে কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং আমাদেরকে ও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এই নেয়ামতের মুল্যায়ণকারী জামা'তের অন্তর্ভূক্ত করুন (আমীন)।

# ‘খোলাফায়ে রাশেদীন’-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং ইসলাম সেবায় অসামান্য অবদান

**মুহাম্মদ তারীফ হোসেন**
ছাত্রঃ ৬ষ্ঠ বর্ষ, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

মহান আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াতে বলেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

অর্থাৎ, “তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন, যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দেবেন। তাঁরা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে না। আর এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে, এরাই হবে দুষ্কৃতিকারী।”

এ আয়াতে কৃত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মহান আল্লাহ্ তা'লা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর তিরোধানের পর খেলাফত ব্যবস্থাপনা কায়েম করেন। এই খেলাফত **‘খেলাফতে রাশেদা’** নামে পরিচিত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর তিরোধানের পর যথাক্রমে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), হযরত উমর ফারুক (রা.), হযরত উসমান গণি (রা.), হযরত আলী মুর্তজা (রা.) খেলাফতের আসনে সমাসীন হন। নিম্নে **‘খোলাফায়ে রাশেদীন’**-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইসলাম সেবার অনবদ্য অবদান তুলে ধরা হল:

## হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)

*[খেলাফতকাল: ৬৩২-৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ]*

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর নাম ছিল **আব্দুল্লাহ বিন আবি কোহাফা**, তাঁর আসল নাম **‘আতীক’** কিন্তু আরবের প্রথা অনুযায়ী তিনি তাঁর ছেলের নাম **বকর** থেকে **আবু বকর** নামে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল উসমান (ডাক নাম কোহাফা) এবং তাঁর মাতার নাম ছিল **উম্মুল খায়ের সালমা**। তিনি ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের বনি তাইম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি পুরুষদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাবীর সত্যতাকে নিশ্চিত বলে গ্রহণ করেন এবং এভাবে **‘সিদ্দিক’** উপাধি লাভ করেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর একান্ত প্রচেষ্টার ফলে মক্কার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাদের মধ্যে হযরত উসমান (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.), হযরত আব্দুর রহমান (রা.) এবং হযরত সা'দ (রা.) অন্যতম। তিনি মহানবী (সা.)-এর মক্কা থেকে মদীনা হিজরতের সময় তাঁর সহযাত্রী ছিলেন এবং তাঁর সাথে সেই সফরে **‘সাওর’** গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-র কন্যা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

বিদায় হজ্জের পরে যখন মহানবী (সা.) গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন, তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে দৈনন্দিন নামাযে ইমামতি করার নির্দেশ দেন। মহানবী (সা.)-এর শোকাবহ ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা.) প্রথম খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁকে মহানবী (সা.)-এর আকস্মিক মৃত্যুতে উদ্ভূত একটি অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিকে সামাল দিতে হয়। কিছু গোত্র প্রকাশ্যে ইসলামকে অস্বীকার করে বসে, কেবল এই কারণে যে, তাদের গোত্রীয় প্রধান মহানবী (সা.)-এর খলীফার প্রতি অনুগত থাকার প্রয়োজন মনে

করেনি। শুধু তাই নয় বরং তাঁরা নব প্রতিষ্ঠিত খেলাফতকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকে। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের অভিসন্ধি জানতে পেরে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং তাদের বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন।

**দ্বিতীয়তঃ** হযরত আবু বকর (রা.) বড় যে সমস্যার সম্মুখীন হন, তা ছিল বহু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করে, যা ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ এবং দরিদ্রদের তত্ত্বাবধানের জন্য অপরিহার্য ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে, প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তিকে যাকাত দিতে হবে এবং তিনি এই লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

সবচেয়ে ভয়াবহ সমস্যা এই ছিল যে কিছু সংখ্যক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মিথ্যা নবুয়্যতের দাবি করে বসে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। বনু হানিফা গোত্রের **মুসায়লামা কাযযাব, ইয়েমেনের আসওয়াদ আনসি, বনী আসাদ গোত্রের তোলায়হা, ইয়ারবু গোত্রের সাজাহ্ নামী এক খ্রিস্টান নারী** নবুয়্যতের দাবি করে। মুসায়লামা কাযযাব এবং আসওয়াদ আনসি বিপুল সৈন্য সমারোহ করে এবং কিছু সংখ্যক মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা দখল করে নেয়। হযরত আবু বকর (রা.) এসব বিদ্রোহী মিথ্যা নবুয়্যতের দাবিকারকদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রসদের স্বল্পতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা তাকে দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেন।

তাঁর খেলাফতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্জনের একটি হল পবিত্র কুরআনকে একত্রে সংগৃহীত করা। যদিও মহানবী (সা.) স্বয়ং পবিত্র কুরআনের লিখন ও বিন্যস্তকরণ কাজ সুসম্পন্ন করেছিলেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত তা বিবিধ চামড়ার টুকরো, বৃক্ষ পত্ররাজি এবং পাথরের ফালিতে লিখিত ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) এই সকল বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত অংশকে সংগ্রহ করে একত্রিত করেন এবং কুরআন সংরক্ষণের নিমিত্তে হিফযকারীদের ব্যবস্থাপনাকে পদ্ধতিগতভাবে পূনর্বিন্যস্ত করেন।

হযরত আবু বকর (রা.) সেই দশজনের একজন ছিলেন যাদেরকে মহানবী (সা.) তাদের জীবদ্দশায়ই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে বলেন **'আবু বকর এ উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তবে যদি ভবিষ্যতে কোন নবী হন তিনি ব্যতীত।'** *(জামেউস সগীর, ২য় খণ্ড, পৃ.১৩৭)*

হযরত আবু বকর (রা.) কিছুকাল অসুস্থ থাকার পর ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩ আগস্ট মোতাবেক ১৩ হিজরির ২২ জমাদিউস সানি মদীনায় পরলোক গমন করেন।

## হযরত উমর ফারুক (রা.)

*[খেলাফতকাল: ৬৩৪-৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ]:*

তাঁর ব্যক্তিগত নাম ছিল **'উমর', 'ফারুক'** তাঁর উপাধি এবং **ইবনে আল খাত্তাব** তাঁর পারিবারিক নাম। তাঁর ডাক নাম **আবু হাফসা**। তিনি (রা.) ৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের **আদিয়া** গোত্রে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তিনি সিরিয়া ও ইরাকে বাণিজ্য প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দিতেন। যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর নবুয়্যতের ঘোষণা দিলেন হযরত উমর বিন খাত্তাব ইসলামের একজন কট্টর প্রতিপক্ষ হয়ে গেলেন। তিনি বিরোধীতায় এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেলেন যে একদিন তলোয়ার হাতে মহানবী (সা.)-কে হত্যার জন্য ঘর থেকে বের হলেন; পথিমধ্যে কেউ তাঁকে অবগত করল যে, তাঁকে প্রথমে নিজ ভগ্নি ও ভগ্নিপতির সাথে সুরাহা করা উচিত, কেননা তাঁরা ইতোমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি সরাসরি তাদের নিকট গেলেন এবং দরজায় কড়া নাড়লেন। তিনি ঘরের ভেতর থেকে পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত শুনতে পাচ্ছিলেন। এতে তাঁর রাগ আরো বেড়ে যায় এবং তিনি তাঁর ভগ্নিপতিকে প্রহার করতে শুরু করেন এবং তাঁর বোনকে আহত করেন যে তাঁর স্বামীকে রক্ষার চেষ্টা করছিল। তাঁর বোন তাঁকে দৃঢ়স্বরে বলল **'উমর! তুমি আমাদের যতখুশি প্রহার করতে পার কিন্তু আমরা আমাদের বিশ্বাসকে কখনো পরিত্যাগ করছি না।'** এ কথায় তিনি শান্ত হলেন এবং তাদেরকে কুরআনের কিছু অংশ পড়ে শোনাতে বললেন। তিনি কুরআনের আয়াত শুনে এতই প্রভাবিত হলেন যে তাঁর চোখ অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তিনি সোজা মহানবী (সা.)-এর নিকট গেলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর তথা ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁর খেলাফতকালে মুসলমানদেরকে **ইরান, ইরাক, সিরিয়া এবং মিসরের** বিরুদ্ধে অনেকগুলো যুদ্ধ করতে হয়। যার ফলশ্রুতিতে এসব দেশের ব্যাপক এলাকা মুসলিম শাসনাধীনে চলে আসে। যখন ১৭ হিজরিতে মুসলমানদের

দ্বারা জেরুজালেম বিজিত হল, তখন রোমানদের অনুরোধে তিনি সেই শহর পরিদর্শন করেন এবং মুসলমান ও জেরুজালেমের অধিবাসীদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। হযরত উমর (রা.) ইসলামের সেবায় এক চমৎকার শাসন ব্যবস্থা চালু করেন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রধান কিছু কৃতিত্ব হলো:

*** মজলিশে শুরা প্রতিষ্ঠা, যা খলীফাকে পরামর্শ দানকারী একটি মন্ত্রিপরিষদ।**

*** পুরো ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রশাসনের সুবিধার্থে প্রদেশে বিভক্তিকরণ।**

*** অর্থ বিভাগের প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে স্কুল এবং মসজিদ নির্মাণ।**

*** ইসলামী হিজরী বর্ষপঞ্জির প্রতিষ্ঠা।**

হযরত উমর (রা.) তাঁর অধিনস্ত লোকদের মঙ্গল চিন্তায় এতটা উদ্বিগ্ন থাকতেন যে, তিনি রাতে ছদ্মবেশে মদীনা শহরে বেরিয়ে পড়তেন নিজ চোখে দেখার জন্য যে কারও কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা। একদা এক রাতে শহর প্রদক্ষিণের সময় তিনি লক্ষ্য করলেন এক মহিলা একটি পাত্রে কিছু রান্না করছিলেন এবং তার বাচ্চারা তার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। তিনি মহিলা থেকে জানতে পারলেন যে বাচ্চারা দু'দিন যাবত ক্ষুধার্ত রয়েছে এবং পাত্র আগুনের উপর রাখা হয়েছে কেবল তাদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য। তিনি তৎক্ষণাৎ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে চলে যান এবং নিজে স্বয়ং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য বহন করে নিয়ে আসেন। পথিমধ্যে তাঁর একজন ভৃত্য তাঁর নিকট থেকে সে বোঝা নিতে চাইলে তিনি তাকে বাঁধা দিয়ে বলেন, **'বিচারের দিনে তো তুমি আমার বোঝা বহন করতে পারবে না।'** মহিলাটি, যে পূর্বে হযরত উমর (রা.)-কে দেখেনি, এতই সন্তুষ্ট হলেন যে তিনি উচ্চস্বরে তাঁর জন্য এই বলে দোয়া করেন, **'আল্লাহ্ তা'লা উমরের পরিবর্তে আপনাকে খলীফা বানান।'** এই কথা শুনে হযরত উমর (রা.) কাঁদতে শুরু করেন এবং কিছু না বলে সে স্থান ত্যাগ করেন।

মহানবী (সা.) তাঁর কন্যা হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.) সর্ম্পকে বলেন, **'যদি শয়তান তাকে কোন রাস্তায় চলতে দেখে তাহলে শয়তান ভিন্ন রাস্তায় পথ চলতে শুরু করে।'** হযরত উমর (রা.) ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ২৬ যিলহজ্জ ২৩ হিজরি মসজিদে নামাযরত অবস্থায় **'আবু লুলু ফিরোজ'** নামক পার্শি গোলাম কর্তৃক ছুরিকাহত হন এবং ১লা যিলহজ্জ ২৪ হিজরি সনে ৬১ বছর বয়সে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি প্রকৃতই একজন মহান খলীফা ছিলেন। তাঁর খেলাফতকাল নিঃসন্দেহে ইসলামের ইতিহাসে এক সোনালী অধ্যায়। হযরত উমর (রা.) সেই দশজনের একজন ছিলেন যাদেরকে মহানবী (সা.) তাদের জীবদ্দশাতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

## হযরত উসমান গণি (রা.)

*[খেলাফতকাল: ৬৪৪-৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ]:*

হযরত উসমান (রা.) হযরত উমর (রা.) কর্তৃক নিযুক্ত পরিষদের দ্বারা তৃতীয় খলীফা নির্বাচিত হন। হযরত উমর (রা.) মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকা অবস্থায় পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের ৬ ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি পরিষদ গঠন করেন।

**১. হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.)**

**২. হযরত তালহা (রা.)**

**৩. হযরত আলী (রা.)**

**৪. হযরত উসমান গণি (রা.)**

**৫. হযরত সা'দ (রা.)**

**৬. হযরত যুবায়ের (রা.)**

হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.) খেলাফতের দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না এবং তিনি অন্য পাঁচজনের পক্ষে খেলাফতের নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। তাই তাকে পরবর্তী খলীফার জন্য জনসাধারণের মতামত গ্রহণের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.) পরিষদের সদস্যগণের এবং বিশিষ্ট মুসলমানদের মতামত গ্রহণ করেন। বেশীরভাগ লোকের মতামত হযরত উসমান (রা.)-এর পক্ষে যায়। তাই তিনি নির্বাচিত খলীফা হিসেবে ঘোষিত হন এবং সবাই তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। হযরত উসমান গণি (রা.) মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হল **আফফান** এবং মাতার নাম আরওয়াহ। তাঁর ডাক নাম **আমর** এবং **আব্দুল্লাহ্**। দরিদ্রদের জন্য তাঁর উদারতা এতই সুবিদিত ছিল যে, তিনি গণি

(সম্পদশালী) উপাধি লাভ করেন। তাঁর (রা.) এবং মহানবী (সা.)-এর বংশ পঞ্চম পুরুষ পূর্ব পর্যন্ত একই ছিল। হযরত উসমান (রা.) তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হযরত আবু বকর (রা.)-এর তবলীগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তি। তিনি (রা.) অত্যন্ত কষ্টের সম্মুখীন হন যখন তাঁর চাচা তাঁকে নির্যাতন করতে শুরু করেন। তিনি দু'বার হিজরত করেন, প্রথমে **আবিসিনিয়ায়** এবং পরে **মদীনায়**। মহানবী (সা.) হযরত উসমানকে অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তাঁর কন্যা হযরত রুকাইয়াকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই দ্বিতীয় কন্যা **হযরত উম্মে কুলসুমকে** তাঁর সাথে বিবাহ দেন। এই জন্য হযরত উসমান (রা.)-কে **'যুন্নুরাইন'** অর্থাৎ **'দুই নূরের অধিকারী'** বলা হয়ে থাকে। হযরত উসমানের (রা.) খেলাফতের সময়ও ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে, ইরানে বিদ্রোহ দমন করা হয়। উত্তরাঞ্চলে রোমানরা আবারও হযরত আমীর মুয়াবিয়ার নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনীর ওপর আক্রমণ করতে আসে এবং আরো একবার মুসলিম সৈন্যদের দ্বারা পরাস্ত হয়। এসব যুদ্ধের ফলে সমগ্র ইরান, এশিয়া মাইনর এবং মিসর মুসলিম নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তাঁর সময়েই নৌবাহিনী এবং ইসলামী নৌবহর প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁর খেলাফতের সময় হযরত আবু বকর (রা.)-এর কৃত সংকলন থেকে পবিত্র কুরআনের কতিপয় প্রামাণ্য নকল প্রস্তুত করা হয় এবং ইসলামী বিশ্বের সকল দেশে প্রেরণ করা হয়। এটি অবশ্যই তাঁর ইসলাম সেবার এক অসামান্য অবদান। আজ আমরা যে পবিত্র কোরআন দেখতে পাই তা তাঁর খেলাফতকালে তাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সংকলিত হয়েছিল। তাঁর খেলাফতের শেষ ছয় বছর **আব্দুল্লাহ বিন সাবার** (এক ইহুদী, যে ইসলামী রাষ্ট্রকে দুর্বল করার দূরভিসন্ধিতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল) ষড়যন্ত্রের কারণে বিশৃঙ্খলা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে অতিক্রান্ত হয়। হযরত উসমান (রা.)-কে ৮২ বছর বয়সে ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা অবস্থায় শহীদ করা হয়। তিনি নিশ্চিতভাবে ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে খেলাফতের মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করেন। তিনিও সেই দশজনের একজন ছিলেন যাদেরকে মহানবী (সা.) তাদের জীবদ্দশাতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

## হযরত আলী মুর্তজা (রা.)

*[খেলাফতকাল: ৬৫৬-৬৬১ খ্রিস্টাব্দ]:*

হযরত উসমান (রা.)-এর শহীদ হওয়ার পর মদীনার সর্বত্র বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। পাঁচ দিন যাবৎ রাজনৈতিক ডামাডোলের পর মিশরীয় বিদ্রোহীদের নেতা ইবনে সাবা হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে এই বলে রায় দেয় যে তিনি একমাত্র খলীফা হওয়ার অধিকারী কারণ হুযুর (সা.) তাঁর স্বপক্ষে একটি ওসিয়্যত করেছিলেন। ২৩ জুন ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে হযরত উসমান (রা.) মৃত্যুর ছয় দিন পর হযরত আলী (রা.) খলীফা নির্বাচিত হন এবং জনগণ তাঁর হাতে বয়াত গ্রহণ করে।

হযরত আলী (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চাচা আবু তালিবের ছেলে ছিলেন। তিনি মক্কায় মহানবী (সা.)-এর ২০ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা.) সেই রাতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিছানায় শায়িত ছিলেন যখন তিনি (সা.) মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেন। মক্কার নেতারা মহানবী (সা.)-কে গ্রেফতার এবং হত্যা করতে চেয়েছিল। পরবর্তী সকালে তারা মহানবী (সা.)-এর বিছানায় তাঁর পরিবর্তে হযরত আলী (রা.)-কে দেখে ক্রোধান্বিত হয়।

হযরত আলী (রা.) একজন দুঃসাহসী এবং দক্ষ ও কৌশলী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে প্রায় সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর অসামান্য বীরত্বের জন্য মহানবী (সা.) তাঁকে **'জুলফিকার'** নামক তরবারী প্রদান করেছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর কন্যা **হযরত ফাতেমা (রা.)**-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। খেলাফতের নির্বাচনের পরপরই তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী মদীনা থেকে ইরাকের **কুফায়** সরিয়ে নেন। তাঁর নির্বাচনের পরপরই তিনি জনগণের বিশেষ করে মহানবী (সা.)-এর প্রভাবশালী সাহাবী যেমন হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত যুবাইর (রা.)-এর উত্থাপিত হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের শাস্তির জনপ্রিয় দাবির সম্মুখীন হন। হযরত আলী (রা.) ঘোষণা করেন যে তাঁর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার রাষ্ট্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিস্থাপন করা এবং কেবল তার পরেই তিনি হযরত উসমান (রা.)-র হত্যাকারীদের বিচারের সম্মুখীন করতে পারবেন। কিন্তু হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত যুবাইর (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর এই সিদ্ধান্তে রাজি হন নি।

তাঁরা সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করা শুরু করেন। হযরত আয়েশা (রা.) প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তিনি হযরত উসমানের হত্যাকারীদের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে হযরত তালহা ও যুবায়ের-এর সাথে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে এক সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন।

হযরত আলী (রা.) যুদ্ধ এবং রক্তপাত এড়াতে যারপরনাই চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যদিও হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত যুবায়ের (রা.) যুদ্ধের পূর্বেই সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব ত্যাগ করেন এবং অন্য কোন শত্রু দ্বারা নিহত হন। হযরত আয়েশা (রা.)-র সৈন্যরা পরাজিত হয় কিন্তু হযরত আলী (রা.) তাকে যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং তাঁর নিরাপত্তার খেয়াল রাখেন। তিনি তাঁর ভাই মোহাম্মদ বিন আবু বকর (রা.)-এর রক্ষাবেষ্টনীতে তাঁকে মদীনায় প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধ **'জঙ্গে জামাল'** অর্থাৎ উটের যুদ্ধ নামে খ্যাত। এর কারণ ছিল হযরত আয়েশা (রা.) যুদ্ধের সময় উটের উপর সওয়ারী ছিলেন। পরবর্তীতে হযরত আয়েশা (রা.) জীবনভর হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অনুতপ্তা ছিলেন।

উটের যুদ্ধের পর হযরত আলী (রা.) হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-কে যিনি তখনও তাঁর হাতে বয়াত গ্রহণ করেন নি ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানান। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই অজুহাতে তাঁর নিকট নিজেকে সমর্পণ করেননি যে, হযরত উসমান (রা.) যিনি উমাইয়া বংশোদ্ভূত ছিলেন তাঁর রক্তের প্রতিশোধ প্রথমে নিতে হবে। আমির মুয়াবিয়া (রা.) আমর বিন আস (রা.)-এর সহায়তায় সৈন্য প্রস্তুত করা শুরু করেন। হযরত আলী (রা.) অন্য কোন বিকল্প না পেয়ে মুয়াবিয়ার সাথে লড়ার জন্য সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হন। ৫৬৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে দুই সৈন্যবাহিনীর মাঝে **'সিফফিন'**-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে ব্যাপক হতাহত হয় কিন্তু যুদ্ধ এই মতৈক্যে শেষ হয় যে, বিষয়টি মধ্যস্থতা কমিটিতে নিষ্পত্তি হবে। এই কমিটিতে হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে আবু মুসা আল আশআরী (রা.) এবং আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষে আমার বিন আস (রা.) প্রতিনিধিত্ব করেন। দুর্ভাগ্যবশত এই মধ্যস্থতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, কারণ আমার বিন আস (রা.) আবু মুসা আল আশআরী (রা.)-এর সাথে গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়ায়। একটি বড় দল, যারা মধ্যস্থতার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছিল, হযরত আলী (রা.) থেকে সরে গিয়ে তাদের জন্য এক নতুন আমীর নির্বাচিত করে নেয়। এই দলটিকে **'খারেজী'** বলা হয়ে থাকে। সর্বপ্রথম হযরত আলী (রা.) তাদেরকে বুঝিয়ে রাজি করানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু তা নিষ্ফল হয়; যা ভয়াবহ যুদ্ধের মোড় নিলে প্রচুর খারেজী নিহত হয়। এই পরাজয়ের পর খারেজীরা হযরত আলী (রা.), হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং আমার বিন আস (রা.)-কে হত্যার পরিকল্পনা করে। পরবর্তীতে দু'জন হত্যা প্রচেষ্টা থেকে বেঁচে যেতে সক্ষম হলেও হযরত আলী (রা.) ফজরের নামাজের জন্য মসজিদে যাবার সময় আক্রমণকারীর দ্বারা গুরুতর আহত হন। দু'দিন পরেই অমিত সাহসী এবং ধর্মপ্রাণ খলীফা ৪০ হিজরির ২০ রমজানে পরলোকগমন করেন। নিঃসন্দেহে হযরত আলী (রা.) খেলাফতের পবিত্রতা এবং মর্যাদা রক্ষার খাতিরে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন। তিনিও সেই দশজনের একজন ছিলেন যাদেরকে মহানবী (সা.) তাদের জীবদ্দশাতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের অসমান্য সেবার জন্য **'খোলাফায়ে রাশেদীন'**-এর সকলকে জান্নাতের প্রশংসিত স্থানে স্থান দান করুন এবং আমাদেরকে তাঁদের পবিত্র আদর্শ অনুকরণের তৌফিক দান করুন। (আমীন)

# ‘খলীফাতুল মসীহ’-গণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তাঁদের ইসলামসেবা

**মুহাম্মদ উসমান গনি**
ছাত্র ষষ্ঠ বর্ষ, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া খেলাফতের খলীফাগণ ঠিক সেভাবেই ইসলাম ও আহমদীয়াতের বিশ্ববিজয়ের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন যেভাবে খোলাফায়ে রাশেদা ইসলামের বিশ্ববিজয়ের জন্য কাজ করে গিয়েছেন। আর তাদের জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত, পদক্ষেপ ও লেখনীই ইসলামের সেবায় উৎসর্গীকৃত। যখন আমরা তাঁদের জীবনী নিয়ে পর্যালোচনা করব তখন এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

## হযরত হাফেয মাওলানা আলহাজ্ব হেকিম নুরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)

*[খেলাফতকাল: ২৭ মে ১৯০৮-১৩ মার্চ ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ]*

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ২৭ মে ১৯০৮ সনে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর মৃত্যুর পর আহমদীয়া খেলাফতের প্রথম খলীফা নির্বাচিত হন। **তিনি ১২৫৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৪১ সনে পাঞ্জাবের শাহপুর জেলার ভেড়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।** তাঁর পিতার নাম **হাফেয গোলাম রসুল সাহেব** এবং মাতার নাম **মোহতরমা নুর বখত সাহেবা।** বংশানুক্রমিক ধারায় তিনি ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর ৩৪ তম অধঃস্তন পুরুষ। তিনি ছিলেন সুপরিচিত ও স্বনামধন্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। চিকিৎসা শাস্ত্রের একজন বিশারদ হওয়ার সুবাদে তিনি দীর্ঘদিন জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজার চিকিৎসক হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। জ্ঞান আহরণের জন্য তিনি দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করেন এবং এই সুবাদে তিনি পবিত্র মক্কা ও মদিনা নগরীতে চার বছর অবস্থানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি ১৮৮৫ সনে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সাথে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ লাভ করেন। ঐশী নির্দেশে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) যখন ১৮৮৯ সালের ২৩ মার্চ লুধিয়ানার সূফী আহমদ জান সাহেবের বাড়িতে সর্বপ্রথম বয়াতগ্রহণ শুরু করেন তখন হযরত নূরুদ্দীন সাহেবের আবেদনে ও সবচেয়ে বেশি পূণ্যবান হওয়ার দরুন তাঁর থেকেই তিনি (আ.) সর্বপ্রথম বয়াত গ্রহণ করেন।

**তাঁর খেলাফতকালের উল্লেখযোগ্য অবদান:** ৩০ মে ১৯০৮ সালে **বায়তুল মাল বিভাগ** প্রতিষ্ঠা, ১৯১০ সালে **তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুল** ও **কাদিয়ানের বোর্ডিং ভবনের** ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, শিখদের ও হিন্দুদের তবলীগের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে **নূর পত্রিকা** কাদিয়ান থেকে ও **আলহক পত্রিকা** দিল্লি থেকে প্রকাশ, আনুষ্ঠানিকভাবে মাদ্রাসা আহমাদীয়া প্রতিষ্ঠা, কাদিয়ানে **পাবলিক লাইব্রেরী** প্রতিষ্ঠা, **আল ফযল** ১৯১৩ সনের ১৮ জুন তাঁরই অনুমতিক্রমে ছাপতে শুরু করে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে তাহরীক করেন। যেমন বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মজীদ প্রকাশ করার তাহ্রীক (বদর-১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৩), কুরআন করীম হিফয করার তাহ্রীক (তাশহিযুল আযহান- মার্চ ১৯১২), বিভিন্ন দেশের ভাষা শেখার তাহ্রীক (আল-হাকাম জুবিলী সংখ্যা), জামা'তের তাজনীদ তৈরীর তাহ্রীক (আল-হাকাম, ১৮ জানুয়ারী ১৯০৯), নূর হাসপাতাল নির্মাণের তাহ্রীক (বদর-১৪ জানুয়ারী ১৯০৯), গরীব মিসকীন ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তার জন্য চাঁদার তাহ্রীক (বদর, ২১ জানুয়ারী ১৯০৯), এবং সর্বশেষ তাহরীক করেন কুরআন ও হাদীসের দরস যেন বন্ধ না হয় (আল-হাকাম, ৭ মার্চ ১৯১৪)। এছাড়া তিনি (রা.) আনুষ্ঠানিকভাবে লঙ্গরখানার প্রচলন করারও তাহরীক করেছিলেন।

১৯১৪ সালের ১৩ মার্চ শুক্রবার বাদ জুমু'আ দুপুর ২:৩০ মিনিটে ৭৩ বছর বয়সে তিনি (রা.) কাদিয়ানে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি (রা.) মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সমান আয়ু প্রাপ্ত হন। যেভাবে হযরত আবু বকর (রা.) রসুলুল্লাহ (সা.)-এর সমান ৬৩ বছর আয়ুপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর সংবাদ খবরের কাগজে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। আর তাঁর মৃত্যুতে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করে মন্তব্যও লিখা হয়। **জমিনদার পত্রিকার** সম্পাদক

মাওলানা জাফর আলী তাঁর সম্পর্কে লিখেন যে, **"তিনি একজন মহান ধর্মীয় পন্ডিত ছিলেন। তাঁর ইন্তেকাল একটি সমূহ ক্ষতি এবং তা মুসলিম সমাজের একটি শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। বলা হয়ে থাকে যে, একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি শতাব্দীর পর জন্মগ্রহণ করে থাকেন। নিঃসন্দেহে তাঁর বিদেহী আত্মা এর দাবি রাখে।"**

## হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ আল-মুসলেহ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-সানী (রা.)

*[খেলাফতকাল: ১৪ মার্চ ১৯১৪-৭ নভেম্বর ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ]*

মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) যখন পৃথিবীতে আগমন করবেন তখন তিনি বিয়ে করবেন এবং তাঁর একজন প্রতিশ্রুত পুত্র সন্তান হবে। এ হাদীস থেকে এ বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সেই বিবাহ একটি বিশেষ বিবাহ হবে আর এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর সাহায্যকারীস্বরুপ একজন বিশেষ পুত্রসন্তানকে যে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবে প্রেরণ করবেন। যাহোক, উপরোক্ত ভবিষদ্বাণীটি পূর্ণতা লাভ করে ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯ সালে তাঁর (রা.)-এর জন্ম গ্রহণের মাধ্যমে। শিক্ষা জীবনে তিনি (রা.) কখনও ধরাবাঁধা পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন না। তিনি স্কুল সমাপনী সরকারি এন্ট্রান্স পরীক্ষাও পাস করতে পারেননি। এটাই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমাপ্তি ছিল। ঘটনাচক্রে নয় বরং ঐশী নিয়তির এক মহান হিকমতের অধীনেই এটি হয়েছিল। যাহোক, তিনি বংশীয় রীতি অনুযায়ী চিকিৎসা বিদ্যা এবং কুরআন ও হাদিসের পাঠ মৌলভী হেকিম নুরুদ্দিন (রা)-এর কাছ থেকে মসীহ মাওউদ (আ)-এর নির্দেশে লাভ করেন।

**তাঁর খেলাফতকালের উল্লেখযোগ্য অবদানঃ** বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের নিমিত্তে তিনি (রা.) ১৯১৯ সালে **মাদ্রাসা আহমদীয়া** প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে প্রশিক্ষণ দিয়ে মুবাল্লেগদেরকে বহিঃর্বিশ্বে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁর জীবদ্দশায় ৪৬টি দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে আহমদীয়া মিশন হাউস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বহির্বিশ্বে ইসলাম আহমদীয়াতের প্রচারের লক্ষ্যে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তবলীগী সফর করেছেন। বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ তাঁর খেলাফতকালে ব্যাপকহারে হয়েছিল। সর্বপ্রথম কুরআনের ইংরেজি অনুবাদসহ তাঁর খেলাফতকালে সর্বমোট ১৪টি ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ অগ্রসরমান ছিল। তিনি ২৮ জুন ১৯১৪ সালে হযরত চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সাইয়াল (রা.) এর মাধ্যমে উপমহাদেশের বাহিরে লন্ডনে জামা'তের সর্বপ্রথম তবলীগী মিশন স্থাপন করেন, ৭ ডিসেম্বর ১৯১৭ সালে ওয়াকফে জিন্দেগীর অর্থাৎ জীবন উৎসর্গেরও তাহ্রীক করেন, ১৯২২ সনের ১৫-১৬ এপ্রিল **মজলিসে মুশাবেরাত** (পরামর্শ সভার) প্রচলন করেন, অভ্যন্তরীণভাবে জামা'তকে ৫টি ভাগে বিভক্ত করেন, ১৯২২ সালে **'শুদ্ধি আন্দোলন'**-এর বিরুদ্ধে আহমদীদেরকে জিহাদ করার ঘোষণা দেন, ১৭ জুন ১৯২৮ সালে সর্বপ্রথম সমগ্র ভারত উপমহাদেশব্যাপী সীরাতুন্নবী (সা.) দিবস উদযাপনের প্রচলন করেন, ১৯৩৪ সনে ২৭টি মুতালেবাত বিশিষ্ট তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দেন, ১৯৪৪ সনের ৪ জুন তা'লীমুল ইসলাম কলেজ কাদিয়ানের উদ্বোধন করেন, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে লাহোরে **'সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া'** প্রতিষ্ঠা করেন, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৭ বাংলা ভাষার ওপর হস্তক্ষেপ না করার জন্য পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেন, ১৯৫০ সালের ৩১ মে রাবওয়াতে কাসরে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দপ্তর, তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দপ্তর, লাজনাহ ইমাইল্লার দপ্তর প্রভৃতি বিভাগসমূহের কেন্দ্রীয় অফিসের ভিত্তিস্থাপন করেন, ১১ মে ১৯৪৪ **ফযলে উমর রিসার্চ ইন্সটিটিউট** প্রতিষ্ঠা করেন, ১১মে ১৯৪৪ সালে খিলাফত লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন, হিফযে কুরআনের তাহরীক করেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর উপরোক্ত তাহরীকসমূহ ছাড়াও তাঁর সমস্ত লেখনী ও বক্তৃতাসমূহ ইসলামের সেবায় অসামান্য অবদান রাখছে। তিনি (রা.) ১৯৬৫ সালের ৭-৮ নভেম্বরের মধ্যবর্তী রাত ২:২০ মিনিটে নিজ মাতৃভুমি পাকিস্তানের রাবওয়ায় পরলোক গমন করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে জান্নাতের প্রশংসনীয় স্থানে স্থান দান করুন।

## হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল-সালেস (রাহে.)

*[খেলাফতকাল: ৮ নভেম্বর ১৯৬৫-৯ জুন ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ]*

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস-সানী (রা.) তাঁর জন্মের পূর্বেই বলেন, **"খোদা তা'লা আমাকেও সংবাদ দিয়েছেন, আমি তোমাকে এমন এক ছেলে দান করব যে ধর্মের নাসের (সাহায্যকারী) হবে এবং ইসলামের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ হবে"**। অন্যত্র প্রতিশ্রুত মসীহ মাওউদ (আ.)-কেও আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রপৌত্রের জন্মের সুসংবাদ প্রদান করতে গিয়ে

বলেন যে, **"আমি তোমাকে একজন পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি যে তোমার পৌত্র হবে"**। উম্মুল মু'মিনীন হযরত মুবারাকা বেগম সাহেবাকেও স্বপ্নে এ বিষয়ে সংবাদ দেয়া হয়েছিল। সে বহু কাঙ্খিত ভবিতব্য ১৬ নভেম্বর ১৯০৯ সালে হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.)-এর জন্মের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। তিনি (রাহে.) ১৭ এপ্রিল ১৯২২ সনে মাত্র ১৩ বছর বয়সে কুরআন হিফয করার সৌভাগ্য লাভ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পর তিনি **অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়** থেকে অর্থনীতিতে এম. এস. সি. ডিগ্রি লাভ করেন।

**তাঁর খেলাফতকালের উল্লেখযোগ্য কিছু দিক:** পাকিস্তান সরকারকর্তৃক ধর্মপরায়ণ সংখ্যালঘু আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণার প্রেক্ষিতে তাঁর দিক নির্দেশনা যা তিনি জামা'তকে প্রদান করেছিলেন, তার ফলশ্রুতিতে জামা'ত সার্বিকভাবে বিভাজনের কবল থেকে রক্ষা পায়। তাঁর দিকনির্দেশনায় আহমদীয়া জামা'ত বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, মিশন হাউস নির্মাণ ও পরিচালনায়, মসজিদ নির্মাণ, পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করে। তিনি (রাহে.) ইসলাম ও আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসার, মসজিদ ও মিশন হাউস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তবলীগী সফরও করেছিলেন।

**তাঁর তাহরীকসমূহ:** ১৮ জানুয়ারি ১৯৭০ সালে খেলাফত লাইব্রেরি ভবনের ভিত্তি স্থাপন, ২৪ মে ১৯৭০ সালে ঐতিহাসিক পশ্চিম আফ্রিকা সফর শেষে লন্ডন প্রত্যাবর্তনের পর ঐশী ইঙ্গিতে আফ্রিকার আর্তমানবতার কল্যাণের লক্ষ্যে স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, হেল্প সেন্টার, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য নুসরাত জাহাঁ স্কিমের ঘোষণা, গরিব-মিসকীনদের খাবার দেয়া, ফযলে উমর ফাউন্ডেশন, ওয়াকফে আরযী, জামা'তের শতবার্ষিকী উপলক্ষে নির্দিষ্ট সংখ্যায় তাস্‌বীহ ও তাহমীদ, দুরুদ শরীফ, ইস্তেগফার ইত্যাদি পাঠ, সুরা বাকারার প্রথম ১৭ আয়াত মুখস্থকরণ, আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনায় বিশ্বব্যাপী কলমী বন্ধুত্ব স্থাপন, সর্বদা হাসিখুশি থাকা, বেশী বেশী সালামের প্রচলন, প্রতি মাসের শেষ সোমবার ও বৃহস্পতিবার নফল রোযা রাখা, এশার নামাজের পর হতে ফজরের নামাজের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের জন্য দোয়া, **হাসবুনাল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল** অধিক সংখ্যায় পাঠ, দৈনিক কমপক্ষে ৭ বার সূরা ফাতিহা পাঠ এবং এর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে চিন্তা করা, ফযলে উমর ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, নুসরাত জাহাঁ রিজার্ভ ফান্ড ইত্যাদির তাহরীক করেছিলেন। অবশেষে তিনি ১৮৮২ সনের ৮-৯ জুনের মধ্যবর্তী রাত পৌনে একটার সময় বায়তুল ফযল ইসলামাবাদ, পাকিস্তানে পরলোক গমন করেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন।

## হযরত মির্যা তাহের আহমদ
## খলীফাতুল মসীহ্ আল-রাবে (রাহে.)

*[খেলাফতকাল: ১০ জুন ১৯৮২-১৯ এপ্রিল ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ]*

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ১৮ ডিসেম্বর ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ আল-মুসলেহ মাওউদ (রা.) এবং মাতার নাম হযরত সৈয়দা মরিয়ম বেগম সাহেবা। তাঁর পিতা-মাতার বিবাহের খুতবা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সৈয়দ সারোয়ার শাহ সাহেব পড়ানোর সময় বলেছিলেন যে, এটি আমার দৃঢ় প্রত্যয়, এই সৈয়্যদার সাথে বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে এমন একজন ধর্মসেবকের জন্ম হবে, যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছিল। এরই ফলশ্রুতিতে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি (রাহে.) ১৯৪৪ সালে তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। এরপর লাহোর সরকারী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং প্রাইভেটে বি.এ পাশ করেন। ৭ ডিসেম্বর ১৯৪৯ সনে তিনি জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়াতে ভর্তি হন এবং ১৯৫৩ সালে শাহেদ ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালে লন্ডনে উচ্চশিক্ষা লাভ করার পর তিনি ধর্ম সেবার উদ্দেশে নিজ জীবন উৎসর্গ করেন।

**তাঁর খেলাফতকালের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান:** সর্বপ্রথম ১৩ জুন ১৯৮২ সনে ফিলিস্তিনে নির্যাতিত-নিপীড়িত মুসলমানদের জন্য দোয়ার তাহরীক, ১৯৮২ সালের ২৯ অক্টোবর **'বুয়ুতুল হামদ'** স্কীমের অধীনে দুস্থ ও এতিমদের জন্য বাড়িঘর নির্মাণকরণ, ১৯৮৫ সালে ওয়াকফে জাদীদের তাহরীককে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতকরণ, ১৯৮৬ সালের ৪ মার্চ জামা'তের শাহাদাতবরণকারীদের স্মরণে সৈয়দনা বেলাল ফাণ্ডের প্রবর্তন, ১৯৮৭ সালের ৩ এপ্রিল জুমুআ'র খুতবায় ধর্মসেবার উদ্দেশ্যে মহান **'ওয়াকফে নও'**-এর তাহরীক, পরবর্তীতে তাদেরকে উত্তম তরবিয়্যতের মাধ্যমে অন্যদের থেকে পৃথক প্রমাণিত করার তাহরীক, ১৯৮৭ সনের ৪ ডিসেম্বর **আসিরানে রাহে মাওলার** (আল্লাহ্‌র পথে বন্দীদের মুক্তির) জন্য দোয়া, ১৯৯১ সালের তাহরীকগুলোর মধ্যে, ওয়াকফে জাদীদের অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, মুয়াল্লেমদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ, বিশ্বের নিরাপত্তা, শান্তি ও মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব

হওয়ার জন্য দোয়া, আফ্রিকার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য সারা বিশ্বের আহমদীদের কাছে সাহায্যের তাহরীক, মসনুন দোয়া পাঠ, ১৯৯৮ সনের ৫ জুন অ্যালুমিনিয়ামের বাসন-কোসন ব্যবহার না করে স্টিলের বাসন কোসন ব্যবহার করার, ৭ আগস্ট সমগ্র বিশ্বের জামা'তে, বিভাগে ও বাড়িতে লাল খাতা রাখার নির্দেশ, ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে সারা বিশ্বের ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও স্বচ্ছল ব্যক্তিদেরকে কাদিয়ানে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার, ২০০৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি হুযুরের শ্রদ্ধেয় মাতার স্মরণে **'মরিয়ম শাদী ফান্ড'**-এর তাহরীক, যেন এর মাধ্যমে জামা'তের গরিব মেয়েদের বিয়েতে সাহায্য করা যায়, যাতে তাদের পিতামাতা বিয়ের সময় তাদের কিছু উপহার সামগ্রী দিতে পারেন, ৩১ জুলাই ১৯৯৩ সালে যুক্তরাজ্যের ২৮ তম সালানা জলসায় আন্তর্জাতিকভাবে বয়াত অনুষ্ঠানের প্রচলন, ১৯২২ সালে এমটিএ (MTA) তে হুযুরের খুতবা শোনা ও দেখার মাধ্যমে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইলহাম 'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব' ভবিষ্যদ্বানীটি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এছাড়াও তিনি নাসের ফাউন্ডেশন, আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা HUMANITY FIRST, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং **বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদের** ভিত্তিপ্রস্তর রেখেছিলেন ।

তিনি তবলীগী কাজে বিভিন্ন দেশেও ঐতিহাসিক সফর করেছিলেন এবং বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। চতুর্থ খলীফার যুগে জামা'ত অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যায় অনুসারি লাভ করেছে যাদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও রাষ্ট্র প্রধানরাও অন্তর্ভুক্ত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৭ সালে নাইজেরিয়া হতে আগত দুজন রাজার বয়াত গ্রহণ করার মাধ্যমে ইমাম মাহদী (আ.)-এর বিখ্যাত ইলহাম **'বাদশা তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে'** পূর্ণতা লাভ করে। ঐশী জামা'তের বিরোধিতা একটি চিরন্তন রীতি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সরকার জামা'তের সদস্যদের উপর অমানবিক নির্যাতন করা শুরু করে এবং ১৯৮৪ সালে জিয়াউল হকের কুড়িতম অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে এর চুড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। তিনি (রাহে.) ১৯৮৮ সালের ১০ জুন তাদের সকল শীর্ষনেতাদের চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন এবং বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেন। মুবাহালার চ্যালেঞ্জের ৯ সপ্তাহ পর ১৯৮৮ সালের ১৭ আগস্ট জেনারেল জিয়াউল হকের সবোর্চ্চ নিরাপত্তাবিশিষ্ট বিমান আকাশে দৃষ্টান্তমূলকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া আহমদীয়াতের সত্যতার এক জলন্ত নিদর্শন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র সমস্ত লেখনী এবং এম.টি.এ.-তে প্রচারিত তাঁর ৩০৫টি তরজমাতুল কুরআন ক্লাস ও মুলাকাত প্রোগ্রাম, প্রশ্নোত্তর সভা ইসলামের একটি মহান সেবা। ১৯ এপ্রিল লন্ডন সময় সকাল ৯:৩০ মিনিটে প্রায় ৭৫ বছর বয়সে তিনি (রাহে.) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইসলামাবাদের টিলফোর্ডে ওফাত লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের অসামান্য ইসলাম সেবা গ্রহণ করুন এবং এর উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করুন, আমীন।

## হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ
## খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)

*[খেলাফতকাল: ২২ এপ্রিল ২০০৩-চলমান]*

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ ১৯৯০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর রাবওয়া, পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম **হযরত সাহেবজাদা মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব** এবং মাতার নাম **সাহেবজাদী নাসেরা বেগম সাহেবা**। তিনি হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের পৌত্র এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর প্রপৌত্র এবং দ্বিতীয় খলীফার দৌহিত্র হন। তিনি রাবওয়ার তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং রাবওয়ার তা'লীমুল ইসলাম কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং বি.এ পাস করেন। ১৯৭৬ সনে ফয়সালাবাদ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি অর্থনীতিতে এম.এস.সি. ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৭৭ সালে তিনি নিজ জীবন ধর্ম সেবার জন্য উৎসর্গ করেন। পরবর্তীতে নুসরাত জাহাঁ স্কীমের অধীনে আফ্রিকায় চলে যান। সামাজিক ও শিক্ষামূলক এ স্কীমটি পশ্চিম আফ্রিকায় বহুসংখ্যক হাসপাতাল ও স্কুলের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। ফলশ্রুতিতে তিনি ঘানার কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অবস্থিত আহমদীয়া সেকেন্ডারি স্কুল ইচারকিউরের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন। তাকে ঘানার উত্তরাঞ্চল ডেপালিতে অবস্থিত আহমদীয়া কৃষি খামারের ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। সেখানে তিনি দুবছর কাজ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অর্থকরী ফসল হিসেবে সর্বপ্রথম গমের পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা সফল হয়। এ বিষয়টিকে একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় ও ঘানার কৃষি মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করা হয়। এটি আফ্রিকার অর্থনীতিতে বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে এবং স্বনির্ভরতার পথকে সুগম করেছে।

**তাঁর তাহরীকসমূহ:** ২২ এপ্রিল ২০০৩ সালে লন্ডন সময় রাত ১১:৪০ মিনিটে **'মজলিসে ইন্তেখাবে খেলাফত'**-এর নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হন।

ঐ দিনই তিনি তাঁর প্রথম বক্তৃতায় জামা'তকে সর্বপ্রথম দোয়ার তাহরীক করতে গিয়ে বলেন যে, **"অনেক দোয়া করুন, অনেক দোয়া করুন, অনেক দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন নিজ থেকে সাহায্য সমর্থন প্রদর্শন করেন, যেন আহমদীয়াত উন্নতির ধাপ অতিক্রম করে দ্রুত সামনে অগ্রসর হতে পারে।"** ২৫ এপ্রিল পুনরায় তিনি জামা'তের সদস্যদেরকে দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, **"আমার জন্য বেশী বেশী দোয়া করুন যেন মহান আল্লাহ্ তা'লা আমার মধ্যে এমন শক্তি ও যোগ্যতা সৃষ্টি করেন যাতে আমি জামা'তের সেবা করতে পারি আর এর মাধ্যমে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে পারি।"** সেপ্টেম্বর মাসে আহমদী ডাক্তারদের সাময়িকভাবে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে মানবতার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করার তাহরীক করেন, অধিক সংখ্যায় দুরুদ শরীফ পাঠ, ইরানের ভয়াবহ ভূমিকম্পে আক্রান্ত লোকদের সাহায্যের জন্য তাহরীক করেন। **২০০৪ সনের তাহরিকসমূহ:** ২৩ জানুয়ারি এতীম ও দরিদ্রদের সাথে সদাচরণ, শর্তানুযায়ী যাকাত আদায় করার তাহরীক করেন, মার্চ মাসে বাংলাদেশের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য দোয়ার এবং এ দোয়াটি বেশি বেশি পাঠ করার তাহরীক করেন, **রাব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বাদা ইয হাদায়তানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব** (সূরা আল ইমরান-৯), এপ্রিলে শিশুদের সঠিকভাবে শিক্ষা প্রদানের, মে মাসে শর্তানুযায়ী চাঁদা প্রদানের, জুন মাসে আফ্রিকার মসজিদ, মিশন হাউস, স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আহমদী আর্কিটেক্ট ও প্রকৌশলীদের এগিয়ে আসার তাহরীক করেন, লাজেমী চাঁদা আদায়ের প্রতি যত্নবান হওয়ার, ২০০৮ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ সদস্যকে ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আর সম্প্রতি হুযুর (আই.)-এর সাথে বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমেলার অনুষ্ঠিতব্য ভার্চুয়াল মুলাকাতে এক প্রশ্নের উত্তরে জামা'তের ৫০% সদস্যকে ওসিয়্যাত করার নির্দেশ প্রদান করেন, ৩ সেপ্টেম্বর ইসলামের শান্তির বাণী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ও নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াতের জন্য, সেপ্টেম্বরে নও মোবাঈনদেরকে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় অন্তর্ভূক্তির জন্য, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ সালে মহানবী (সা.) এর বিরুদ্ধে আরোপিত ঘৃণ্য আপত্তির জবাব দেয়ার জন্য খোদ্দাম ও লাজনার বিশেষ টিম গঠনের তাহরীক করেন, ২৭ মে জামা'তের শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে নফল রোজা ও বিশেষ দোয়ার তাহরীক করেন, তাহের ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্ন দেশে জামেয়া আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা ছাড়াও তিনি আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কমপক্ষে HSC পর্যন্ত পড়ার তাহরীক করেছেন।

**ইসলাম ও আহমদীয়্যাতের প্রচারণায় তাঁর অবদান:** তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে মানবজাতির সামনে তুলে ধরার, বিশ্বশান্তির জন্য ও ৩য় বিশ্ব যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য বিভিন্ন সময় পৃথিবীর বড় বড় নেতাদের কাছে চিঠি লিখে আসছেন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখছেন। যেমন, ৮ অক্টোবর ২০১৯ UNESCO, ৪ ডিসেম্বর ২০১২ সালে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে, ৬ অক্টোবর ২০১৫ ডাচ পার্লামেন্টে, ১৭ অক্টোবর ২০১৬ কানাডার পার্লামেন্টে, ২৭ শে জুন আমেরিকার ক্যাপিটালহিলে ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান করেছেন। বর্তমানে তাঁর খেলাফতকালে ৮টি পৃথক পৃথক স্যাটেলাইটের মাধ্যমে, রেডিও স্টেশন ও বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারে কাজ সারা বিশ্বে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সর্বদা হুযুরের জন্য দোয়া করার এবং হুযুরের প্রত্যেকটি তাহরীকে লাব্বাইক বলে সেগুলোর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

***তথসূত্র:***

*[ইসলামী ইবাদত, ইসলামে আহমদীয়া খেলাফত, পাক্ষিক আহমদী-৩১ মে ২০০৯, মাসিক আহবান-২০১০ ইত্যাদি]*

# মহানবী(সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষযুগে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী

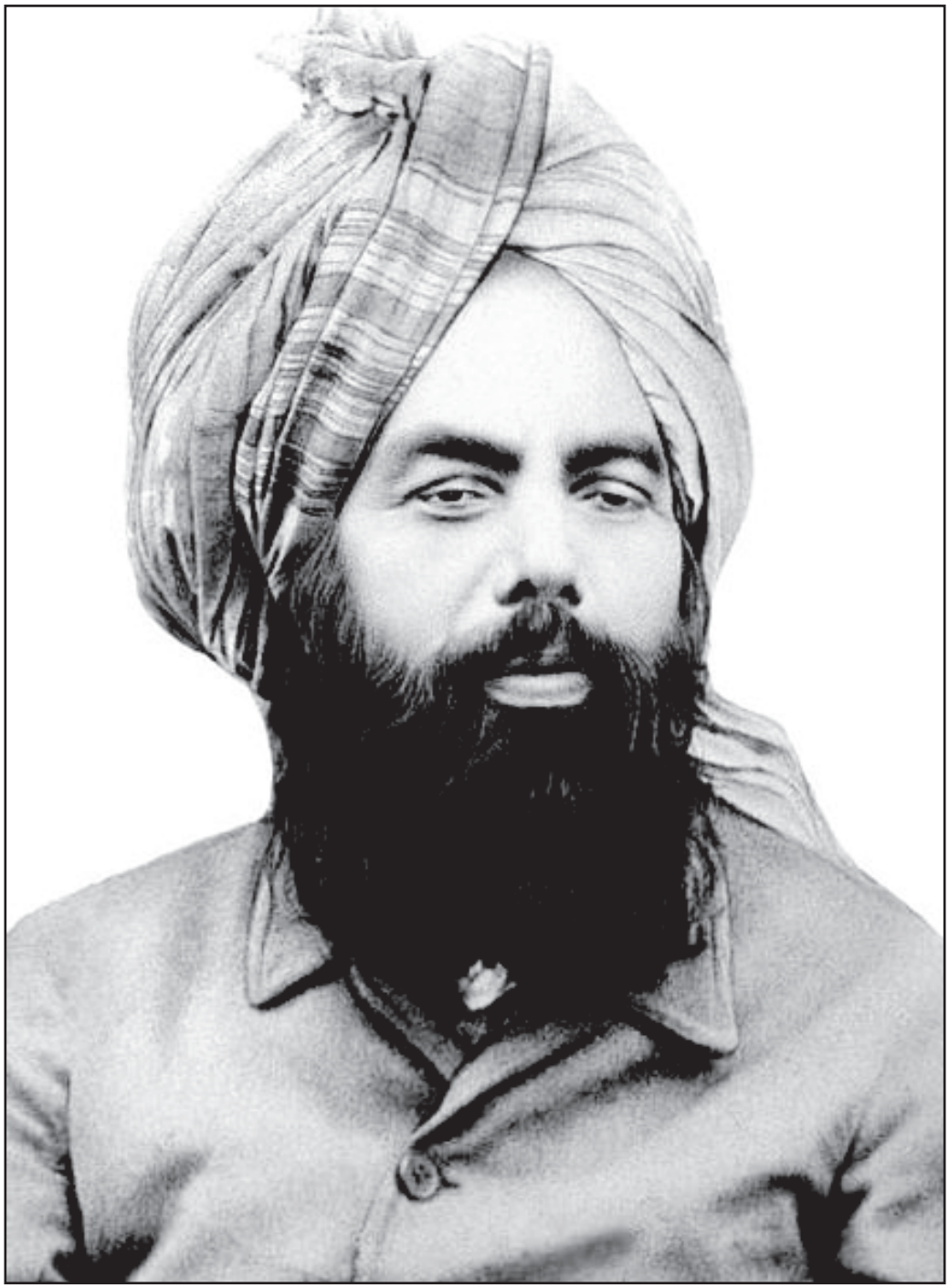

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (খ্রি. ১৮৩৫-১৯০৮)

# ইসলামের নবজাগরণের নতুন অধ্যায় ‘খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়্যত’ অর্থাৎ নবুয়্যতের পদাঙ্ক অনুসরণে খিলাফত

হযরত আলহাজ্জ হেকিম নূরুদ্দীন(রা.)
খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (১৯০৮-১৯১৪)

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)
খলীফাতুল মসীহ সানী (১৯১৪-১৯৬৫)

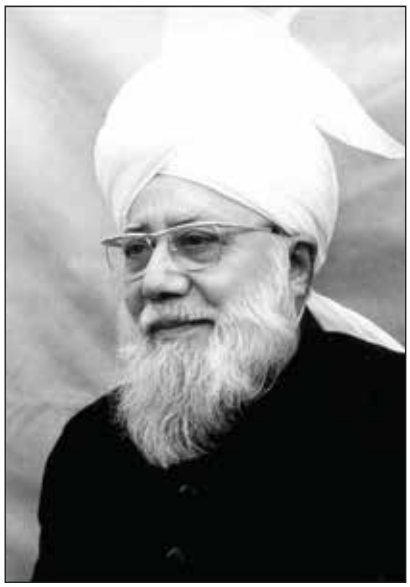

হযরত মির্যা নাসের আহমদ(রাহে.)
খলীফাতুল মসীহ সালেস (১৯৬৫-১৯৮২)

হযরত মির্যা তাহের আহমদ(রাহে.)
খলীফাতুল মসীহ রাবে (১৯৮২-২০০৩)

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ(আই.)
খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (২০০৩ - )

# শিক্ষা সফর-২০১৯

## স্থান: কক্সবাজার, সেন্ট মার্টিন ও মহেশখালী

**মাসুম আহমদ**
**ছাত্র: ৬ষ্ঠ বর্ষ, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ**

কুরআন কারীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **"সিরু ফীল আরদ"** অর্থাৎ তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। এর অর্থ এটাই যে পৃথিবীতে ভ্রমণ করে আল্লাহ্ তা'লার মহান সৃষ্টি অবলোকন কর যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের হৃদয়ে ধারণার জন্ম নেয়। আল্লাহ্ তা'লার এই সৃষ্ট জগত কতটা সুন্দর আর বিস্ময়কর তা যদি কেউ স্বচক্ষে না দেখে তাহলে তার জন্য বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর।

জীবনের ধর্ম গতি আর প্রাণের ধর্ম চলা। গতিতেই মুক্তি চলাতেই আনন্দ। মানুষের শিরা-উপশিরায় রয়েছে ভ্রমণের নেশা, অজানাকে জানার অদম্য স্পৃহা। তাই স্বভাবতই সে ভ্রমণবিলাসী। বিপুলা এ পৃথিবীর আয়োজন কত বৈচিত্রময়, এই দেশ দেশান্তর, কত নদী নির্ঝর, কত গিরি পর্বত, কত অরণ্য সৌন্দর্য্যের কলি সাজিয়ে পৃথিবীর বুকে ছেয়ে আছে।

যেহেতু জামেয়াতে শৃঙ্খল জীবনের বেড়াজালে থেকে একঘেয়েমি মানসিক একটা চাপের সৃষ্টি হয় ও মনের মধ্যে বিরক্তিভাব চলে আসে। মনস্তাত্ত্বিক শান্তি ও সতেজভাব ও বিচিত্র সম্পর্কে জানার জন্য জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি বছর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে জামেয়ার চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষের দু'টি ব্যাচ শিক্ষা সফর করে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে আমি এই সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছি। আল্লাহ্ তা'লার এই ফজল অগণিত অফুরন্ত যার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ্ তা'লার এই সৃষ্ট পৃথিবী কতটা সুন্দর আর মনোমুগ্ধকর সে সম্পর্কে বর্ণনা দেয়ার সেই জ্ঞান আমার নেই। আমার স্বল্প জ্ঞানে যতটুকু পারি বর্ণনার চেষ্টা করছি।

**সময়টা ছিল ২০১৯ এর মার্চ মাস।** আমরা দুই ব্যাচ মিলে ৯ জন সাথে তিনজন নিগরান শিক্ষকসহ মহান আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করে সফর শুরু করি। ঢাকা থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সফর হয় বাসে। অনেক অপেক্ষার পর স্টাডি ট্যুরে যাচ্ছি এটা ভেবেই আনন্দে আত্মহারা ছিলাম সবাই। প্রতিটি মুখেই ছিল সতেজ আর প্রাণবন্ত আনন্দের ছাপ। আনন্দে বিভোর আর আবেগময় চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল সদ্য শিশু মায়ের কোলে প্রাণ খুলে বিনা বাঁধায় হাসছে। এই ভাবাবেগের অনেক বড় একটি কারণও ছিল। সমুদ্রে বিপদ সংকেত দেখা দেওয়ায় আমাদের সফর না হওয়ার আশঙ্কা ছিল। সবাই হুযুরের কাছে দোয়ার চিঠি লিখি। অবশেষে আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে বিপদ কেটে যায় তাও আবার আমাদের সফরের নির্ধারিত সময়ের পুর্বেই।

যাহোক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে করতে টেকনাফে পৌঁছাই। সেখান থেকে সেন্টমার্টিন যাওয়ার জন্য জাহাজের টিকিট

আগে থেকেই কাটা ছিল। আমরা সবাই তিন তলা বিশিষ্ট জাহাজে উঠি। সবার ইচ্ছামাফিক জাহাজের তৃতীয় তলায় যেখান থেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আর সাগরের বড় বড় ঢেউ দেখা যাবে এমন একটি জায়গায় সবাই জায়গা দখল করি। সবাই একসাথেই বসি। শিক্ষকদের থেকে কিছুটা দূরত্বে যেন মন খুলে উল্লাস করতে পারি।

**নাফ নদীর** অপূর্ব দৃশ্য আমাদের মোহিত করছিল। ওপারে মায়ানমারের গাঢ় সবুজ পাহাড়গুলো গাম্ভীর্যের সাথে আমাদের সাথে চলছিল। নাফ নদীর ছোট ছোট ঢেউ জাহাজের ধাতব কাঠামোর সাথে ধাক্কা খেয়ে সাদা ফেনা সৃষ্টি করতে লাগলো। একটুপর লক্ষ্য করলাম অতি শুভ্র কিছু গাংচিল আমাদের লঞ্চের সাথে পাল্লা দিয়ে লঞ্চের গাঁ ঘেঁষেই উড়ে যাচ্ছে।

লঞ্চ যখন নদী থেকে সমুদ্রে প্রবেশ করলো দু'পাশের তীর যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। ডুবো প্রবাল-টিলায় সমুদ্রের ঢেউগুলো আঁছড়ে পড়ে এক অনন্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হচ্ছিল। নদী ও সাগরের মিলনস্থল চোখে পড়ল যাকে মোহনা বলা হয়। আমাকে রীতিমত অবাক আর চিন্তায় ফেলে দিল আর খোদা তা'লার শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে বাধ্য হলাম। সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে জাহাজের খেলা উপভোগ করে আমরা **সেন্ট মার্টিন দ্বীপে** পৌঁছলাম।

জেটি ঘাটের পাশেই ছোট খাটো একটা বাজার। বাজারে বিভিন্ন প্রকারের সামুদ্রিক মাছের দোকান, চায়ের দোকান থেকে শুরু করে সব ধরনেরই দোকান ছিল। এছাড়া বার্মিজ জিনিসপত্রের দোকানও ছিল। এগুলো দেখতে দেখতে আমরা আমাদের বুকিং করা রিসোর্টে গিয়ে উঠলাম। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেখানে আহমদী একজন সদস্যের রিসোর্ট ছিল, সেখানেই আমরা উঠি। সবাই সবার নির্ধারিত রুমে ব্যাগপত্র রেখে ফ্রেশ হয়ে নামাযের প্রস্তুতি নেই। আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হোটেল মালিকের প্যাকেজের অন্তর্ভূক্ত ছিল। নামাজ আদায় করার পর আমরা আমাদের জন্য নির্ধারিত একটি খাবার হোটেলে যাই। দুপুরের খাবারে অন্যতম আকর্ষণ ছিল সামুদ্রিক ভাজা মাছ। যার স্বাদ এখনও জিভে লেগে আছে।

খাবারের পর আমরা বিশ্রামের কথা না ভেবে ছুটে চলি সাগড়ের টানে। দীপটিকে ঘিরে রাখা সমুদ্র সৈকত অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের আধার। ভালো করে সময় নিয়ে দেখার জন্য সবাই সাইকেল ভাড়া করি। সাইকেল নিয়ে সোজা সমুদ্রতীরে চলে যাই। তীরে যেতেই সমুদ্র থেকে ভেসে আসা বাতাস গায়ে লেগে প্রাণ জুড়িয়ে যায় আমাদের। সাগর তীরের প্রবাল আর প্রবালে এসে ধাক্কা খাওয়া সাগরের ঢেউ নজর কেড়ে নেয়, তৈরি করে একটি স্বপ্নের আবেশ। সাইকেলে করে সমুদ্রতীরে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করি এরপর ঢেউয়ের সাথে বন্ধু পাতানোর ইচ্ছেটা আর ধরে রাখতে পারলাম না। দৌড় দিলাম সমুদ্রের বুকে, নিজেকে ভাসিয়ে দিলাম ঢেউয়ের সাথে। অপর দিক থেকে ছুটে আসা বড় ঢেউগুলো আটকানোর চেষ্টায় ঢেউ আমাকে জয়ী হতে দিলনা। ঢেউ জয়লাভ করলেও আনন্দলাভ তো আমাদেরই হয়েছিল। সমুদ্রের নোনা জলে সন্ধ্যা পর্যন্ত লাফালাফি করলাম। মন সায় দিচ্ছিলো না উঠে যাওয়ার। মনে হচ্ছিল এত তাড়াতাড়ি কেন সন্ধ্যা নেমে আসলো। সমুদ্রের ঠান্ডা পানিতে হাত-পা সবই জমে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল জলেই ভালো ছিলাম। রিসোর্টে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে মাগরিব ও এশার নামাজ আদায় করলাম। এরপর রাতের খাবার খাওয়ার পর তারা ভরা জ্যোৎস্না রাতে সমুদ্রের তীরে হাঁটতে গেলাম। রাতের সাগর পুরোই অন্যরকম। সমুদ্রের জল, ঢেউয়ের শব্দ, আকাশ ভরা ঝিকিমিকি তারা নিজেকে যেন দুনিয়া থেকে আলাদা করে দিল। কিছুক্ষণের জন্য আমি স্বপ্নে ভাসলাম। এরপর আমরা ক'জন তীর ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। রাত বেশী হয়ে যাওয়ায় রিসোর্টে ফিরে যেতে হচ্ছিল কিন্তু আমার হৃদয় কোন ভাবেই তা মানতে রাজি হচ্ছিল না। বারবার এটাই বলে উঠছিল কিসের রিসোর্ট তুই এখানেই থাক। কিচ্ছু করার ছিল না, মনের সাথে যুদ্ধ করে

রিসোর্টে গেলাম। ভ্রমণের ক্লান্তি আর ঘোড়াফেরার ক্লান্তি চোখে ঘুম নামিয়ে আনলো। মনে মনে এই আগ্রহ সাঁড়া দিয়ে উঠছিল রাতটা তাড়াতাড়ি শেষ হলে আল্লাহ্ তা'লার নাম নিয়ে ভোর হতেই আবার বেরিয়ে পরবো খোদার অপরূপ সৃষ্টি অবলোকন করার জন্য।

**পরের দিন সকাল** থেকে কী করব কোথায় কোথায় ঘুরব এসব চিন্তা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম বুঝলামই না। অতিরিক্ত ক্লান্তির কারণে ঘুম থেকে উঠতে সেদিন সবারই দেরি হয়ে গিয়েছিল। ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে সবাই রওয়ানা দিলাম ছেঁড়া-দ্বীপের উদ্দেশ্যে। সেন্ট মার্টিন দ্বীপের পাশে ছেড়াদ্বীপ। দুটোর দুরত্ব মোটামুটি ভালই। ছেড়া-দ্বীপে যাওয়ার জন্য ইঞ্জিনচালিত নৌকা ভাড়া করা হল। ছেড়া-দ্বীপে গিয়ে মনটা সম্পূর্ণ ভরে গেল। ছেড়া-দ্বীপের সৌন্দর্য্য নজরকাড়া। দুর থেকে ঢেউ আস্তে আস্তে বড় হয়ে পাথরের উপর খুব জোরে আছড়ে পড়ে। দৃশ্যটি খুবই মনোমুগ্ধকর। সেখানে ঢেউয়ের সাথে নিজেদের কিছু ছবি তুলে নিলাম। এরপর দ্বীপটির চতুর্পাশ ঘুরে ঘুরে দেখলাম। সমুদ্রের মাঝখানে একটি দ্বীপ উঁচু-নিচু টিলা আর নাম না জানা গাছ-গাছালি দিয়ে ভরা। সত্যিই অভাবনীয় সুন্দর। ছেড়া-দ্বীপের সৌন্দর্য্য উপভোগ করে আমরা পুনরায় সেন্টমার্টিন দ্বীপে আমাদের রিসোর্টে ফিরে আসলাম। দুপুরের নামাজের পর খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সবাই প্রস্তুত হয়ে আবার সমুদ্রস্নানে গেলাম। সমুদ্রতীরের বালুতে আমরা কিছুক্ষণ ফুটবল খেললাম। খেলা শেষে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লাম সমুদ্রে। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় আমরা রিসোর্টে যাই। বাকি কাজ শেষ করে আমরা লেখক হুমায়ূন আহমেদের বাড়ী দেখতে যাই। অপরূপ একটি জায়গায় তিনি তার **সমুদ্র বিলাস** নামের বাড়িটি নির্মাণ করেন। স্যার হুমায়ূন আহমেদের বাড়ীর গেটের সামনে আমরা মাছের বারবিকিউ পার্টি করি। মাছটি এতটাই বড় ছিল যে আমাদের সবার জন্য একটি মাছই যথেষ্ঠ ছিল। সম্ভবত মাছটির নাম বোয়ালনান্দা। মাত্রই মাছটিকে জেলে সমুদ্র থেকে এনেছিল আর আমরা সেটিকে খেয়ে সাবাড় করলাম। আমাদের বারবিকিউ পার্টি শেষ করে আবার রিসোর্টে ফিরে আসলাম। আজকের মত বিরতি।

**সেন্ট মার্টিনে শেষ দিন।** সবাই আবার সাইকেল ভাড়া করে পুরো দ্বীপটি ঘুরে দেখার উদ্দেশ্যে রওনা দেই। সমুদ্রের তীরে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে সাইকেল চালানোটা খুবই আনন্দের ছিল। সাইকেলের চাকার সাথে সাথে দুচোখ ঘুরছিল আর সৌন্দর্য্য উপভোগ করছিলাম। এত সুন্দর জায়গা যে, চোখ ফেরানো মুশকিল। কোন পাশ রেখে কোন পাশ দেখবো তা ঠিক করাই দুষ্কর হচ্ছিল। এক পর্যায়ে সবাই ক্লান্ত হয়ে পরলাম। এতটা পিপাসা লেগেছিল যে সবাই পানি পানি বলে চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল। পানির সাথে থেকেও পান করতে পারছিলাম না নোনা জল হওয়ার কারণে। আমাদের এই অবস্থায় মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পিপাসা নিবারণের ব্যবস্থা করলেন। একজন লোক তরমুজ নিয়ে আসলো। সবাই যথেষ্ট পরিমাণে তরমুজ খেলাম। সৌন্দর্য্য অবলোকনের পিপাসা যেন কোনোভাবেই শেষ হচ্ছিল না। যাইহোক সময়ের দিকে খেয়াল রেখে আমরা রিসোর্টে ফিরে আসলাম। সবাই নিজেদের গুছিয়ে নামাজ আদায় করে হোটেলে খেতে যাই। খাওয়া শেষ করে আমরা যেই জাহাজ দিয়ে দ্বীপে এসেছিলাম সেই জাহাজেই আবার টেকনাফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। দীপ ছেড়ে যেতে ইচ্ছে না হলেও মনকে সান্ত্বনা দিয়ে রওনা হলাম কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত অবলোকন করতে। টেকনাফ থেকে কক্সবাজার আসতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল। হোটেলে এসে যার যার ব্যাগ হোটেলে রেখে সমুদ্রের তীরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলাম। সন্ধ্যার সময় সমুদ্র পাড়ের বিমোহিত মুহূর্ত নিজে উপভোগ না করলে বোঝা দায়। যাইহোক সমুদ্রতীরের মৃদু বাতাসের সাথে সমুদ্রের বড় বড় ঢেউয়ের গুঞ্জন অন্যরকম এক অনুভুতি সৃষ্টি করছিল। সমুদ্র তীরের এই আনন্দঘন মুহূর্ত উপভোগ করে আমরা হোটেলে ফিরে আসলাম। নামাজ আর রাতের খাবার শেষ

করে পরের দিনের চমকের কথা ভাবতে ভাবতে স্বপ্নের জগতে চলে গেলাম।

হঠাৎ অ্যালার্ম বেজে উঠল। ফজরের নামাজ আদায়ের পর ক্লান্তি বেশি থাকায় আর একটু বিশ্রাম নেই। যেহেতু পুর্বেই সবাই সাগরে সূর্যোদয় দেখেছিলাম সেন্টমার্টিন দ্বীপে আর কেউ যায়নি কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে সূর্য উদয় দেখতে। অল্প বিশ্রামের পর নাস্তা করলাম সবাই। নাস্তার পর সবাই নিজ নিজ প্রস্তুতি সেরে চান্দের গাড়িতে করে সাগর তীরের মেরিন ড্রাইভ রাস্তা দিয়ে কক্সবাজারের ইনানী বীচ দেখতে যাই। সেখানে বাইক ভাড়া করি এবং সমুদ্রতীর ধরে সবাই বাইক চালাই। ইনানী বীচের সৌন্দর্য্য উপভোগ করে আমরা পুনরায় হিমছড়ি ঝর্ণা উপভোগ করতে যাই।

হিমছড়ি ঝর্ণা দেখে সবাই আবার হোটেলে ফিরে যাই। প্রস্তুত হয়ে হোটেল থেকে একটি অটো করে আবার চলে যাই সমুদ্রে। লোভ সামলাতে না পেরে সবাই উল্লোসিত হৃদয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দেই। কক্সবাজারের সমুদ্রের ঢেউ সেন্টমার্টিনের ঢেউ থেকে তুলনামূলকভাবে বেশী ক্ষিপ্র। কিন্তু সেন্টমার্টিনের সমুদ্র অধিকতর পরিষ্কার আর স্বচ্ছ। সন্ধ্যায় সমুদ্র থেকে উঠে হোটেলে ফিরে যাই। ফ্রেশ হয়ে সবাই সমুদ্রতীরের নানা প্রকারের দোকানগুলোতে ঘুরে ঘুরে যে যার মত পছন্দের জিনিস কিনি। এরইমধ্যে কক্সবাজারে একদিন অতিবাহিত করলাম।

পরের দিন আমাদের **মহেশখালী** যাওয়ার পালা। অটো-যোগে আমরা মহেশখালী যাওয়ার জন্য ঘাটে যাই। মহেশখালী ভ্রমনটিও আমাদের প্যাকেজের মধ্যেই ছিল। আমাদের এই আনন্দভ্রমনের জন্য খুব সুন্দর একটি জাহাজ আমাদের জন্য ঘাটে অপেক্ষমান ছিল। সুসজ্জিত জাহাজটি দেখেই মন ভরে গেল। যাত্রা শুরু হল; সমুদ্রের বুক চিরে মহেশখালীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হল। প্রায় তিন ঘন্টা সমুদ্র ভ্রমণের পর আমরা মহেশখালী পৌঁছলাম। সেখানে পৌঁছানো মাত্রই আমরা অটো ভাড়া করলাম পাঁচটি স্পট দেখানোর চুক্তিতে। দুটি স্বর্ণমন্দির, লবন বানানোর প্রজেক্ট, শুটকি বানানোর স্থান, পানের বড়জ ইত্যাদি। মহেশখালীর বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখার পর দুপুরের ভোজন সেখানেই সেড়ে নিলাম। মহেশখালী ভ্রমন শেষে আবার সেই জাহাজে করেই কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। মহেশখালীর পানের কথা অনেক শুনেছি, আসলেই মহেশখালীর পানের মজাই অন্যরকম। সন্ধ্যার আগে আগে কক্সবাজারে ফেরত আসলাম। সফরের নির্ধারিত দিনগুলোর মধ্যে ওই দিনই ছিল আমাদের শেষ দিন। সন্ধ্যায় সবাই হোটেলে এসে নিজেদের ব্যাগ গুছিয়ে নেই। অনেকেই বার্মিজ মার্কেট দেখার জন্য যায় এবং পছন্দনীয় জিনিসপত্র কিনে ফিরে আসে। কেউ কেউ পরিবার-পরিজনের জন্য উপহার সামগ্রী ক্রয় করে। আর আমরা কক্সবাজারের সমুদ্র তীরে কাঁকড়া ফ্রাই খাই। বিদায়ের পালা। সবার চেহারাতেই বিদায়ের কালো মেঘের ঘনঘটা। আবারো মনকে বুঝিয়ে আমরা নিজেদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। যাহোক পরিশেষে আবারো খোদা তা'লার অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্ট এই পৃথিবীর সৌন্দর্য্য অবলোকন করলে প্রত্যেক স্বচ্ছ হৃদয়বান ব্যক্তি সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে যে এই অপরূপ সৃষ্টির একজন স্রষ্টা রয়েছেন।

# শিক্ষকমণ্ডলী, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ
## Teachers, Jamia Ahmadiyya Bangladesh

মোবাশশেরউর রহমান
প্রিন্সিপাল

মাওলানা বশিরুর রহমান
ভাইস প্রিন্সিপাল

মাওলানা সালেহ আহমদ
শিক্ষক

মাওলানা জাফর আহমদ
শিক্ষক

মাওলানা জহির আহমদ
শিক্ষক

মাওলানা মাসুম আহমদ
শিক্ষক

মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার
শিক্ষক

মাওলানা নাসের আহমদ
শিক্ষক

মাওলানা সৈয়দ মোজাফ্ফর আহমদ
শিক্ষক

মাওলানা মোহাম্মদ আল হক
শিক্ষক

মাওলানা হাজারী আহমদ আল-মুনিম
শিক্ষক

মাওলানা মোহাম্মদ সালেহ
শিক্ষক

মাওলানা মোমেন হোসেন
শিক্ষক

মোহাম্মদ ইমরান সাঈদ
শিক্ষক

২০২০ সালে বাংলাদেশের ৯৬ তম সালানা জলসায় আগত হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম আব্দুল মাজেদ তাহের সাহেবের সাথে
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের শিক্ষকবৃন্দ

২০২০ সালে বাংলাদেশের ৯৬ তম সালানা জলসায় আগত হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম আব্দুল মাজেদ তাহের সাহেবের সাথে
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ থেকে পাশকৃত ৬ষ্ঠ শাহেদ ব্যাচ

মোহতরম আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের সাথে
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ থেকে পাশকৃত ৭ম শাহেদ ব্যাচ

২০২০ সালে বাংলাদেশের ৯৬ তম সালানা জলসায় আগত হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম আব্দুল মাজেদ তাহের সাহেবের সাথে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ

কাদিয়ানের নাযের তালীমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযি এবং আগত বিদেশি বন্ধুদের সাথে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের ৮ম শাহেদ ব্যাচের শিক্ষার্থীবৃন্দ

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে আয়োজিত বৌদ্ধ ধর্মের ওপর বিশেষ সেমিনার

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে আয়োজিত নতুন ছাত্রদের ওরিয়েন্টেশন

বার্ষিক কাদিয়ান সফরকালে তাজমহলের সামনে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের শাহেদ ব্যাচের শিক্ষার্থী ও নিগড়ান শিক্ষক

বার্ষিক শিক্ষা সফর, ২০১৯
কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন

বার্ষিক শিক্ষা সফর, ২০২০
কুষ্টিয়ার রবীন্দ্রনাথ কুঠিবাড়ির সামনে

বার্ষিক বনভোজন, ২০১৯
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর

# শিক্ষা সফর-২০২০

## স্থানঃ কুষ্টিয়া, খুলনা, বাগেরহাট ও সুন্দরবন

**মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম**
ছাত্রঃ ৪র্থ বর্ষ, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আমরা জাতি হিসেবে বাঙ্গালী আর আমাদের স্বভাবের সাথে ভ্রমনপ্রিয়তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর শুধু বাঙ্গালীরাই নয় বরং প্রত্যেকটি জাতির মাঝে ভ্রমণের আকাঙ্খা বিদ্যমান। এমনকি পবিত্র কুরআনে ভ্রমণের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, **'সিরু ফিল আরদ্'** অর্থাৎ তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। কিন্তু যখন ভ্রমণের বিষয়টি আমাদের সামনে আসে আমাদের মন চলে যায় দূর দেশে। অথচ আমাদের আশে পাশে আমাদের মাতৃভূমিতে কত যে সৌন্দর্য্য বিদ্যমান তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না এবং তা অনুধাবন করার চেষ্টাও করি না। তাইতো কবির ভাষায় বলতে হয়,

*আপনার রূপে আপনি মুগ্ধ দেখিতে পাও না তুমি,*
*কতো যে ফুল ফুটে ওঠে গো তোমার চরণ মাধুরী চুমি।*
*কুড়ায়ে সে ফুল গাথিঁ আমি মালা কাব্যে ছন্দে, গানে*
*মালা দেখে সবে, জানে না মালার ফুল ফুটে কোন্‌খানে।*

প্রত্যেক বছরের মতো যথারীতি এবারও আমরা **'জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ'**-এর ৪র্থ এবং ৫ম বর্ষের ছাত্রবৃন্দ এবং শিক্ষক মহোদয় মিলে বাংলার এই অপার সৌন্দর্য্য স্বচক্ষে দর্শনের জন্য বেরিয়ে পড়ি। আবহাওয়ার সাথে সংগতি রেখে ৪ মার্চ থেকে ৯ মার্চ আমাদের ভ্রমণের জন্য চূড়ান্ত তারিখ হিসেবে নির্ধারন করা হয়। যাইহোক নিধারিত তারিখে অর্থাৎ ৪ মার্চ ২০২০ তারিখের বিকেল ৪ টার সময় আমরা জামেয়া থেকে দোয়ার মাধ্যমে আমাদের সফর শুরু করি। এই যাত্রায় খাকসারের সাথে আরও পাঁচ জন সফরসঙ্গী ছিল যার মধ্যে একজন নিগরাণ শিক্ষকও ছিলেন। সর্বপ্রথমেই আমরা পঞ্চগড় বাস-স্ট্যান্ড থেকে খুলনাগামী একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসে করে রওনা হই। সত্যিকার অর্থেই ভ্রমণের শুরু থেকেই হৃদয়গভীরে এক অজানা কৌতুহল উঁকি দিচ্ছিল। বাস তার গতিতে এগোতে লাগলো এবং ধীরে ধীরে চারপাশে অন্ধকার নেমে আসল। আমরা এতটাই উৎফুল্ল ছিলাম যে, চারপাশের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে কখন যে রাতের খাবারের সময় হয়ে গেল টেরই পেলাম না। যথারীতি বাস একটি স্থানে যাত্রাবিরতি দিল এবং আমরা রাতের খাবারের জন্য একটি রেস্তোঁরায় গেলাম রাত প্রায় ৯.০০ টার সময় আমরা রাতের খাবার খেয়ে পুনরায় বাসে চড়লাম। বাস দ্রুত গতিতে চলতে থাকলো এবং রাত প্রায় ১১.৩০ টায় আমাদের বাসযাত্রা শেষ হল। তারপর সি.এন.জি যোগে আমরা কুষ্টিয়ার বিখ্যাত আবাসিক হোটেল 'হোটেল আজমেরী' তে রাত্রি যাপনের জন্য রওয়ানা হলাম। আমাদের আগমনের কথা জানতে পেরে স্থানীয় জামাতের মুরব্বী জনাব শোওয়েব আহমদ সাহেব পূর্ব থেকেই এই হোটেলের চারটি কামরা আমাদের জন্য বুক্‌ড করে রেখেছিলেন। যাহোক অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে আমরা এই হোটেলে একটি রাত অতিক্রম করলাম।

পাশের নিখুঁত পরিচ্ছন্ন পরিবেশ চোখকে অপার স্নিগ্ধতা এনে দেয়। কুঠিবাড়ীর পিছনে অনেক অনেক বছরের পুরনো আম গাছগুলো মুকুলে পরিপূর্ণ। এক পাশে বড় একটি পুকুর রয়েছে। কবি রবীন্দ্রনাথ এই পুকুরটির নাম রেখেছিলেন 'পদ্মা'। পুকুরের এক পাশে মাঝারী আকারের নৌকার মতো একটি যান দেখতে পাওয়া যায়। এটিই সেই 'পদ্মার বোট' নামক ট্রলার যার কথা কবীর বিভিন্ন সাহিত্যে পাওয়া যায়। পুকুরের একপাশে দুটি প্রকান্ড তুলাগাছ পুকুরের সৌন্দর্যকে আরো বর্ধিত করেছে। পুকুরের পশ্চিম পার্শ্বে রয়েছে **'রবীন্দ্র নাট্যমঞ্চ'**। আমরা এগুলো খুব ভালোভাবেই উপভোগ করলাম। যখন আমরা রবীন্দ্র কুঠিবাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করলাম বাড়ীর প্রতিটি কোণে প্রাণের চঞ্চলতা উপভোগ করলাম। বাড়ীর প্রতিটি দেয়ালে রবীন্দ্র পরিবারের দূর্লভ তথ্যচিত্র আমাদের নজরে আসে। কবীর নিজ হাতে লিখা চিঠি এবং কিছু স্বর্ণালী স্মৃতি ঝুলানো রয়েছে। এখানে আমরা এই মহান কবীর ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পেয়েছি। আমরা অনায়েসে বলতে পারি এখানে এসে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশেষে কবি গুরুকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণে রেখে আমরা রবীন্দ্রকুঠি ত্যাগ করি।

পরের দিন সকালের নাস্তা একটি রেস্তোঁরায় সেরে ফেললাম জায়গাটির নাম ছিল কুষ্টিয়া কোটবাড়ী। নাস্তা শেষ করে আমরা মুরব্বী সাহেবকে সফরসঙ্গী করে বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি **'মীর মোশার্‌রফ হোসেন'**-এর জাদুঘর দেখতে গেলাম, সেখানে গিয়ে আমরা মীর মোশার্‌রফ হোসেনের নির্মিত প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখলাম এবং বিদ্যালয় সংলগ্ন জাদুঘরে প্রবেশ করলাম। সেখানে আমরা তার ব্যবহৃত অনেক তৈজসপত্র এবং তার ব্যবহৃত আরাম কেদারা, পালকি, ঢাল আরও অনেক কিছু দেখতে পেলাম এবং তার রচিত কিছু দুস্প্রাপ্য গ্রন্থের নাম নোটবুকে লিখে রাখলাম যেন পরবর্তীতে এগুলো সংগ্রহ করতে পারি। সেখানকার দায়িত্বে থাকা এক ব্যক্তি আমাদেরকে সমস্ত কিছু ঘুরিয়ে দেখালো। কবি মীর মোশাররফ হোসেন-এর ব্যবহৃত প্রাচীন এবং মূল্যবান জিনিসগুলো নিঃসন্দেহে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

বেলা ১০.৩০ এর দিকে মীরের জাদুঘর থেকে আমরা সরাসরি রবীন্দ্র কুঠি বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। এটিও কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত। অতি আশ্চার্যান্বিত হতে হয় এই ভেবে যে, এতো পুরনো এই বাড়িটির কারুকার্য এবং সৌন্দর্য্য এ যুগের যে কোন আধুনিক ভবনকে হার মানাতে সক্ষম। এই কুঠিবাড়ীতেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবসর যাপন করতেন। কবিগুরুর এই বাড়ীর চারপাশে চমৎকার ডিজাইনে তৈরী দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সেই সাথে দেয়ালের পাশে হরেক রকমের বাহারী ফুলের সুবাস এবং ফুল বাগানের সাথে বাঁধা পেয়ে ফিরে আসা সুরভীযুক্ত স্নিগ্ধ বাতাস সত্যিকার অর্থে দেহ ও মনকে উজ্জীবিত করে। চারদিকে এতো দর্শনার্থীর গুঞ্জন মনে হচ্ছে এ যেন সেই ফুল বাগিচা থেকে মধু আরোহণকারী মৌমাছিদের দল। চার

এরপর বাংলার আরেক অনন্য ব্যক্তিত্ব 'লালন শাহ্'-এর মাজারের দিকে রওয়ানা হই। এই সাধকের জন্ম ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে। লালন শাহ্ তার গান, গজল এবং গীতের মাধ্যমে চির অমর হয়ে আছেন। আমরা এই মরমি সাধকের মাজারের প্রতিটি জায়গা অনেক সূক্ষ্মভাবে পরিদর্শন করি। অবশেষে সেখানকার কিছু বাউল শিল্পীর মাধ্যমে লালন শাহ্-এর কিছু গান শুনি এবং দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য মুরব্বী সাহেবের বাসায় যাই। রান্নার প্রশংসা না করলেই নয়! সত্যিই অসাধারণ সুস্বাদু খাবার ছিল। মুরুব্বী সাহেব এতো আন্তরিকতার সাথে আমাদের মেহমান নেওয়াজি করেছেন যে এখনো কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে।

অতঃপর আমরা ঐদিনই খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা হই এবং প্রায় রাত ০৮:০০ টার সময় ট্রেনযোগে খুলনা জামাতে পৌঁছাই। ফ্রেশ হয়ে আমরা এশার নামায আদায় করি এবং রাতের

খাবার খাই। এখানে আমরা দুই দিন দুই রাত অতিক্রম করি। এই দুই দিনে আমরা খুলনার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করি। ৬ মার্চ আমরা খুলনা মসজিদে জুমুআ'র নামায আদায় করি। নামাযের পর পরই আমরা বাগেরহাট ষাটগম্বুজ মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। বাংলার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এই মসজিদটি খাজা খাঁন জাহান আলী নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদটির আশে পাশে মাঠের সমস্ত জায়গাজুড়ে ঘন সবুজ পরিবেশ। আর মসজিদের ভেতরে দর্শনার্থীদের ভীড় থাকলেও এখানে

আমরা একেবারে নীরবতা অনুভব করি। অনেককেই এখানে নীরব দোয়ায় রত থাকতে দেখলাম এবং আমরাও এই মহান কীর্তিমানের সুবিশাল ও সুসজ্জিত নির্মানের (ষাটগম্বুজ মসজিদ) উপর আনন্দচিত্তে নীরব দোয়ার মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করে সরাসরি খাঁন জাহান আলীর মাজার পরিদর্শনে গেলাম। মাজারের সামনে একটি বিশালাকার পুকর রয়েছে। কথিত আছে যে, এখানে খাঁন জাহান আলী দুটি কুমির পালন করতেন। তাই একটু কৌতুহল নিয়ে পুকুরের পাড়ে গেলাম। পরবর্তীতে জানতে পেলাম একটি কুমির মারা গেছে। সংরক্ষিত স্থানে মৃত কুমিরটির ফসিল দেখতে পেলাম। কিছু দূর হাটতেই আমরা পুকুরে বিশাল এক কুমির দেখতে পেলাম। যিনি কুমিরটির দেখা-শুনার দায়িত্বে আছেন তিনি আমাদেরকে একেবারে কাছ থেকে কুমিরটিকে দেখালেন।

এরপর আমরা অদূরেই অবস্থিত **'আটগম্বুজ মসজিদ'** এবং **'জিন্দা পীরের মাজার'** দেখতে গেলাম। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, সন্ধ্যা সাতটার সময় সেখান থেকে পুনরায় খুলনা মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। রাতের খুলনা শহর খুবই মনোমুগ্ধকর। আমাদের গাড়ী খুলনার রূপসা সেতুর কাছাকাছি আসতেই আমরা গাড়ী থেকে নেমে যাই এবং সেতুটি পায়ে হেটে পার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। সেতুর পাশের দোকান থেকে সন্ধ্যার নাস্তা সেরে হাঁটা শুরু করি। এই সেতু থেকে পুরো খুলনা শহরকে ভালোভাবে দেখে নেয়া যায়। আর সেতুর নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া রূপসা নদী আমাদেরকে এক অনন্য সৌন্দর্যের মুখোমুখি করেছে। সেতুর উপর সাদা, লাল ও নিয়ন আলোর ল্যাম্প পোষ্টের আলোয় বড় বড় লঞ্চ এবং ষ্টিমার গুলোকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। এভাবে খুলনায় আমরা দুটি রাত অতিক্রম করলাম।

পরবর্তী দিন অর্থাৎ শনিবার আমরা **মংলা সমুদ্র বন্দর** দেখার জন্য যাত্রা শুরু করলাম। কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমরা সমুদ্র বন্দর পৌঁছে গেলাম। এখন আমাদের এই সমুদ্রপথ পাড়ি দেয়ার পালা। সকাল থেকেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল এবং দমকা হাওয়াও বয়ে যাচ্ছিল। যাহোক এ যাত্রায় আমাদের সাথে খুলনা জামাতের মুরব্বী সাহেবও সফরসঙ্গী ছিলেন। তার উপস্থিতি সত্যিকার অর্থেই আমাদের এই ভ্রমনকে প্রাণবন্ত করেছে। আমরা একটি মাঝারি আকারের ট্রলার ভাড়া করে অথৈ সমুদ্র পানে ছুট দিলাম। আমাদের ট্রলার সমুদ্রের মাঝামাঝি আসতেই বিশাল বিশাল ঢেউ এবং বড় বড় ষ্টিমারের আনাগোনা নজরে আসলো। এ সময় নিজেকে সামলে রাখা যেন অসম্ভব ছিল, নিজেকে কেমন যেন বেখেয়ালি মনে হচ্ছিল। যেন সমস্ত মনযোগ সমুদ্রকে নিয়ে। মনে মনে সমুদ্রকে নিয়ে দু'লাইন কবিতা রচিত হয়ে গেল!

**"সমুদ্রের সংস্পর্শে দাঁড়ালে এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগে,**
**সাগরের কোলে আকাশের লুটোপুটি অসম্ভব ভালো লাগে।**
**সমুদ্রের সংস্পর্শে দাঁড়ালে মৃদু বেখেয়ালী ভর করে মনে,**
**কণ্ঠ চিরে গাইতে ইচ্ছে জাগে এমনও শুভক্ষণে,**
**ওরে..... নীল দরিয়া**
**আমায় দে..রে দে ছাড়িয়া!"**

দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা সম্পন্ন করে আমরা **'করমজল'** নামক স্থানে পৌঁছাই। এই স্থানটিকে সুন্দরবনের অংশ হিসেবে ধরা হয়।

চারদিকে সবুজের ছড়াছড়ি এবং ঘন বন। এই বনের বুক চিরে দর্শনার্থীদের জন্য কাঠের পাটাতনের একটি রাস্তা রয়েছে। এই বনের আশে পাশে বেশ কতক জলাশয় আছে আর এগুলোতে কুমিরের ছড়াছড়ি। বনের মাঝে নানা প্রজাতির প্রাণী রয়েছে এবং এখানে বাঘও রয়েছে। প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্যকে উপভোগ করার জন্য সুউচ্চ একটি **ওয়াচ টাওয়ার** নির্মাণ করা হয়েছে। এই ওয়াচ টাওয়ার থেকে পুরো বনকে এক নজরে চোখ বুলিয়ে নেয়া যায়। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। অবশেষে করমজলকে আমরা ক্যামেরা বন্দি করলাম এবং বনের অন্য পাশে অবস্থিত **কুমিরের প্রজনন কেন্দ্র** দেখতে পেলাম। এখানে বড় বড় কুমিরের পাশাপাশি শত শত কুমিরের বাচ্চা দেখলাম। একইসাথে দর্শনার্থীদের জন্য এক জায়গায় অনেকগুলো হরিণও রয়েছে। মোটকথা খুবই দৃষ্টিনন্দন জায়গা এই করমজল।

অতঃপর আমরা আবার সমুদ্রপথে রওনা হলাম এবং খুলনা পৌঁছে বিকেল ৫ টার সময় মাইক্রোবাসে করে আমাদের মূল আকর্ষণ সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। রাত প্রায় ১১ টার সময় আমরা সুন্দরবন পৌঁছলাম। বলা বাহুল্য যে, এই অঞ্চলে রাতের রাস্তাঘাট অনেক নীরব। অনেক আঁকাবাকা ও সরু রাস্তা, সাথে বাঘের ভয়ও ছিল। প্রতিটি পদক্ষেপে এক অজানা কৌতুহল কাজ করছিল। এই অঞ্চলের মানুষগুলো অত্যন্ত মিশুক এবং অতিথিপরায়ণ। জামাতের কিছু যুবক ও বয়স্ক ব্যাক্তি আমাদের জন্য রাত ১১ টা অবধি অপেক্ষা করে বসে ছিলেন এবং এতো রাতে আমাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

যাইহোক পরদিন আমরা সুন্দরবনের মূল বন দেখার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। এই চিরায়ত সবুজে ঘেরা বনটিকে **'ম্যানগ্রোভ বন'** বলা হয়। কারণ এখানকার পানি অত্যন্ত লবনাক্ত হয়ে থাকে। এই বনের আয়তন প্রায় ৬০০০ বর্গ কিলোমিটার। বঙ্গোপসাগরের কয়েকটি শাখা এই বনকে লোকালয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রেখেছে। একটি ট্রলার ভাড়া করে আমরা ছয়জন এবং সাথে সুন্দরবনের আমীর সাহেব এবং আরো কয়েকজন সদস্য এই সুন্দরবন ভ্রমনে চললাম। আমরা যতক্ষন পর্যন্ত ট্রলারে করে বনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম প্রত্যেকটি মুহূর্তে অসম্ভব এক ভালোলাগা অনুভব করছিলাম। সুন্দরবনের যে স্থানটিতে আমরা গিয়েছি তার নাম হলো **'কলাগাছি'**। এখানে প্রতিটি মুহূর্ত আমরা অসম্ভব আনন্দের সাথে উপভোগ করতে থাকি। বনটি হাজারো পশু পাখির আবাস স্থল, যার মধ্যে **রয়েল বেঙ্গল টাইগার, বানর, হরিণ, ডাহুক, মদনটাক, কুমির** উল্লেখযোগ্য। এখানে **সুন্দরী, গড়ান, গেওয়া, কেওড়া, গোলপাতা** ইত্যাদি গাছপালায় পরিপূর্ণ যা আগে কখনোই দেখা হয়নি। এই বনের একটি বিশেষত্ব হচ্ছে বনের সমস্ত বৃক্ষের শ্বাসমূল রয়েছে। অর্থাৎ গাছের শিকড় গুলো মাটি ভেদ করে উপরে চলে আসে। এত ঘন সবুজের লীলাভূমি আর কোথাও ইতোপূর্বে দেখা হয়নি। এই অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমিকে স্বচক্ষে না দেখলে বুঝতেই পারতাম না যে আমাদের মাতৃভূমি এতো সুন্দর! কেউ স্বচক্ষে না দেখলে এই বনের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করতে পারবে না। আর এভাবেই আমাদের সেই অপূরনীয় আকাঙ্খা পূর্ণতা লাভ করলো। সুন্দরবন দেখার পর নিজেকে এতোটাই সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছিল যে, সেই অনুভূতি প্রকাশ করার মতো কোনো ভাষা নেই। এখনো মনে পরলে সুন্দরবনের সেই অপার সৌন্দর্য আমাকে কল্পনায় হাতছানি দেয়।

**'তোমার চিরসুন্দর রূপ মোরে অসুন্দরের পথ হতি**
**টানি আনিয়াছে হাত ধরি'**

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে বাংলার এমন অপরুপ সৌন্দর্য উপভোগ করার এবং এই সৌন্দর্যের স্রষ্টাকে বেশী বেশী স্মরণ করার সৌভাগ্য দান করুন । (আমিন)

# SPIRITUAL RENOVATION AND MODERN SOCIETY

**Imran Sayed**
Lecturer of English, Jamia Ahmadiyya Bangladesh

Spiritual barrenness, a common phenomenon of society nowadays has raised eyebrows of many. People day by day is losing their grounds in terms of spirituality, losing their grip from the center, God the Almighty. Even those prominent poets during modern period of English literature directly or indirectly pointed out that this world feels a longing for the true purpose of life. They find a lack of assurance, a lack of true wisdom, a lack of peace of mind. In the course of following the trend of acquiring materialism, people slowly becoming hollow. And, many of them do realize that they are away from the purpose for which they are being created. We, however, as the followers of the Promised Messiah (as), the man who was prophesized by Prophet Muhammad (sa) himself, do feel assured and have peace of mind that we have Khilafat. And this big banyan tree like shade that we are enjoying over our head is the serenity which Allah, the Almighty has promised us.

*"Turning and turning in the widening gyre*
*The falcon cannot hear the falconer;*
*Things fall apart; the centre cannot hold;*
*Mere anarchy is loosed upon the world"*

This stanza taken from W.B Yeats's Poem **"The Second Coming"** represents the cycling of centerless indiscipline in the world. The backdrop of the lines was the anarchy of World War I when the powerful became powerless, the rulers became ruled and the society being filled with chaos. That's the time when people went disillusioned from materialism. The things they loved, the life they enjoyed and the pleasure they had, all went in ruins. The clash of the titans snatched away their luxury lives. They are only left with misery now. All that they can hope is a new beginning. At some point it seems that they do realize that center is God and in Him there is pleasure and contentment.

In reality, had they followed the path of Allah, they would never have felt the way they felt then. Because, God Himself is the center and we all revolve around him. If the center is non-existent, we are all in anarchy.

Even those modern poets seem to understand and point out that God is needed. He is Existent. Without him, we are nothing and with him, we have everything. People nowadays do not feel the existence of Allah although they claim to be a believer in God. They are spiritually dead and need a spiritual awakening. And, everytime these times come, a prophet, a warner is sent from God to remind them their duties and purposes.

Another modern poet, T.S. Eliot also showed his concern in his magnum opus **"The Wasteland"** about the divine hollowness and the wait for rejuvenation. In the poem, the poet depicted a picture of a static society that is neither excited nor opting for change. It spends life as it flows and as the time goes by, they are dull. All points to the death of a society, spiritually. The title itself also shows us that the land the people are living is just as the same as carrion.

Now if we attach the poem with present society, we see no difference. The modern life is fragmented, dull and robotic. There is no change, no movement, sterile. They are dead. Nothing can revive them unless and until divine will helps them. When a flower is left without care, it withers. It needs a caretaker to refresh it. Similarly, a man of God is needed to restore peace and order. These observations point to the fact that even poets and litterateur of times knew or seemed to know that a spiritual renovation is due. And, this renovation can only be possible if a man of God brings a change in the society, provides a divine system of eternal hope and assurance.

During the time after Holy Prophet (sa), when Khilafat-e-Rashida was established as per divine rule, the world was restored with peace from momentary chaos. Then Allah the Almighty lifted the Khilafat up after 30 years as was prophesized by Prophet (sa). After almost thousand years a reformer was introduced to the world by God in the name of **Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) of Qadian.** He came to water the dead flowers of Islam. With his blessed touch, the garden is again fragrant. Islam is revived once again. Then he became dear to God. After him Khilafat-e-Ahmadiyya, as was mentioned by the Promissed Messiah[as] as **"Second Manifestation"** was established. And, now we are enjoying its fifth phase. Hazrat Mirza Masroor Ahmad (atba) is the name on whom millions of people rely on in terms of spirituality. His celestial appearance, his sacred messages rejuvenate the dark hearts. He enlightens them towards divine light, shows them the path of righteousness. With his blessed leadership, Jamat-e-Ahmadiyya is progressing day by day preaching true Islam.

Unlike modern centerless society where joy is missing, Khilafat is a blessing that can only be felt from heart. It's bliss and fragrance change the hearts of men. It establishes in them the love of God and Khalifa. It forms a blessed society worldwide, a bond that only God offers. Followers of true Islam enjoy the living God. For them, Holy Quran is the living divine scripture, Holy Prophet (sa) is the living Prophet and Islam is the living religion. The proof of its being living is that an institution will be existent till the ends of time. The Holy Quran says,

***Allah had promised to those among you who believe and do good works that He will surely make them Successors in the earth, as He made Successors from among those who were before them; and that He will surely establish for them their religion which He has chosen for them; and that He will surely give them in exchange security and peace after their fear: They will worship Me, and they will not associate anything with Me. Then who so is ungrateful after that, they will be the rebellious.*** *(Surah Al-Nur, Verse 56)*

This prophecy was fulfilled twice.

Once, when the Holy Prophet (sa) left the earth to meet his Beloved Allah the Almighty, Khilafat-e-Rashida was established as per divine instructions. It was prevalent for almost thirty years and then decline initiated. It was also what Holy Prophet (sa) said that, ***"Islam will have three centuries of greatness."*** *(Bukhari, vol. 4)*

Twice, when the Promised Messiah (as), the man after completing his duty diligently and peacefully demised and left a window open that manifests the light of Allah in the form of Khilafat. A new era of Islam was initiated, Khilafat-e-Ahmadiyya is that latest ray of hope and security. Allah the Almighty bestowed this blessing only to the chosen ones, the **Ahmadiyya Muslim Community.** And, in this community is life.

Modern Society, in contrast, is in absentia of such assurance such divine light for so long and will continue to be. It is dead and sterile as was mentioned previously. To conclude, this spiritually barren society needs spiritual renovation which can only be done by a man of God, a Khalifa. Otherwise, let them analyze fight, discuss and battle, no solution will last unless and untill a divine help comes. We, Ahmadi Muslims, are so fortunate that we have Khilafat, a source of divinity whereas modern society so obsessed with materialism can never detect this divine ray of hope. Before we finish, we pray that Allah, the All-Powerful may guide them to the right path. May Allah bless us to follow the given path rightfully too.

# A BRIEF HISTORY OF JAMIA AHMADIYYA BANGLADESH

**Mobasherur Rahman**
Principal, Jamia Ahmadiyya Bangladesh

Jamia Ahmadiyya Bangladesh was established in Bangladesh in 2002. Bangladesh is one of those lucky countries to have a Jamia, the highest seat of learning on Theology, Language, Comparative religion, Social Science, Public Preaching etc.

A shortage of qualified Murabbi/ Imam/Religious Scholar were felt for many years in Bangladesh. We had only 4-5 Murabbis trained from Qadian/Rabwah who were living at that time of establishment of Jamia in Bangladesh. They were,

1) **Allama Zillur Rahman, trained from Qadian, died in 1964**
2) **Maulana Mumtaz Ahmad, died in Sixties**
3) **Maulana A.K. Muhibullah, died in 1982**
4) **Maulana Farooq Ahmad, died in Eighties**
5) **Maulana Ahmad Sadeq Mahmud (retired)**
6) **Maulana Abdul Aziz Sadeq, died in 2018**
7) **Maulana Anisur Rahman, died in Eighties**
8) **Maulana Syed Ezaz Ahmad, died in 1990**
9) **Maulana Imdadur Rahman Siddique, Previous Principal, Jamia BD**
10) **Maulana Saleh Ahmad, currently working in Jamia BD**
11) **Maulana Abdul Awwal Khan Chowdhury, now National Ameer BD,**
12) **Maulana Bashirur Rahman, Vice-Principal, Jamia BD,**
13) **Maulana Feroz Alam, In-charge, Bangla-desk in U.K.**
14) **Maulana Abdul Matin, trained in Qadian, working in Rajshahi.**

By 2002, sl. no. 1,2,3,4,6,7 & 8 died. So, only six Murabbis were there. Maulana Feroz Alam was posted in Bangla-desk UK. Bangladesh Jamat was expanding and new jamats were forming. We had a dire need of qualified scholar Murabbis. Some Muallims had to be recruited after short course. But need was felt for Highly trained Murabbis.

This situation was brought before the Khalifatul Masih IV (rahe). He immediately instructed to start a Jamia. Bangladesh Jamat was actually not prepared to shoulder the responsibility of 7years course. But Huzur Aqdas (rahe) knew it well. He instructed us to start with a 3.5 years Mubassher Course with only one batch. He guided us the syllabus and course material. That was the starting of Jamia Ahmadiyya Bangladesh in 2002.

Maulana Saleh Ahmad a Rabwah Graduate (Shahid) had been put In-charge. He was the Principal. Modest accomodation was provided to the students-all thirteen in one room and a class room. This humble starting brought good harvest when all

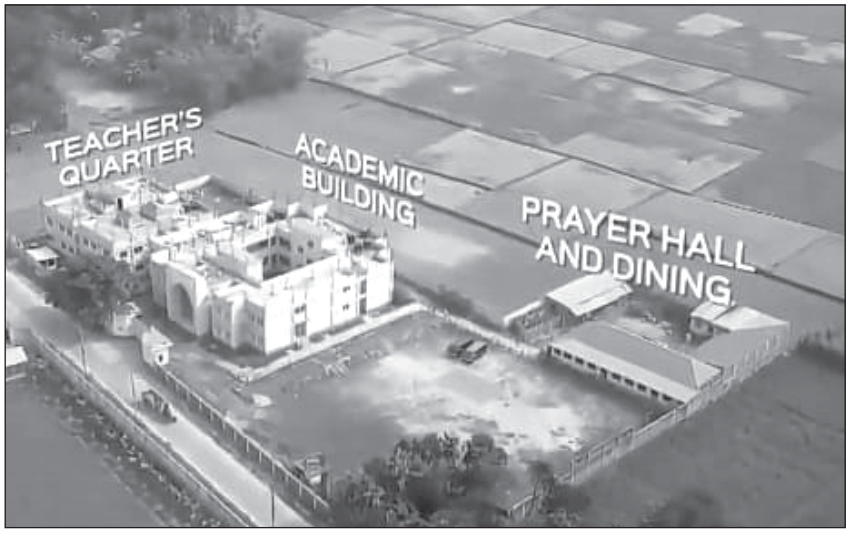


thirteen passed and all were above the expected level of knowledge and spiritually, sound, enthusiasm and good Da'ee. We are so much indebted to Maulana Saleh Ahmad who almost single handedly ran that course and gifted Jamat with thirteen scholars and murabbis.

After the successful completion of first course reports reached Huzur Aqdas (rahe), He was very glad and very kindly approved Bangladesh Jamia to start 7years International Course.

By this time, Bangladesh Jamat had gained some experience and gained confidence. Preparations were started. By this time 2005-2006, Our Headquarter building had just been extended to 5floor which provided the required accomodation, dining and class room facilities and other auxilliary accomodation requirements.

This time Maulana Imdadur Rahman Siddique, a Rabwah trained Murabbi was appointed as Principal. He was a very spiritual personage and had an amputation of his right leg below the knee. This happened when he was delivering Khutba in Khulna mosque. Miscreants put a time bomb just near the podium which blasted in the middle of Khutba. A total of seven Ahmadis were martyred and many injured. After this incident he served as a field murabbi for several years. Then in 2006 he was selected as Principal of Jamia. He ran this Jamia very successfully for 13 long years.

There had been many limitations at Dhaka in H.Q. building. Jamia was allocated the 5th & 6th floor. On the rooftop was a tin-shed where dining facilities had been made. For students there was no playground they had to go out of the premise to some distance in Medical Hostel playground where sometimes they were not welcome. Overall the facilities were conjusted and not proper for the young students to grow-up physically & mentally.

So, a purpose-built accommodation for Jamia Ahmadiyya Bangladesh was felt just after few years of its establishment. But Bangladesh Jama'at could not find a suitable place for that. Also financial ability was a constraint.

During 2015-16 a project for a large accommodation for yearly Jalsa of Bangladesh Jama'at was taken. After much search a large chunk of land adjacent to our Ahmadnagar Jama'at was found and finally selected. It was then decided that it would be proper to establish our Jamia near the proposed Jalsa gah for valid reasons.

So immediately 1.73 Acre land adjacent to our Jalsa gah had been procured (we could not find more land at that time).

On the recommendation of National Jama'at, Huzur Aqdas (atba) approved the project Construction work started immediately and within one and a half year the primary requirement of Jamia accommodation was completed. A beautiful & storied Main Building with attached Hostel Block & a teachers' accommodation (8 flats) was built.

In July 2019 Jamia was shifted from Dhaka to this remote northern part of Bangladesh (450 Km away from Dhaka), a very beautiful scenic place. All students are happy and delighted as they got an open space, large area and playground and proper accommodation and facilities.

We are indebted to Huzur Aqdas (atba) for granting us this excellent building and facilities. We ask your fervent prayers.

‘জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ’ আহমদনগরে স্থানান্তরিত হওয়ার পর প্রথম গ্রুপ ছবি

জামেয়ার শিক্ষক ও ছাত্রদের মাঝে বাংলাডেক্স ইনচার্জ মোহতরম মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব এবং ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব

নূরুদ্দীন
NURUDDIN

*Masum Ahmed*
Editor, Nuruddin
Ahmadnagar, Panchagarh
Phone: +88 01767077109
e-mail: masum2084@gmail.com